শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় ভাগ

তত্ত্ব-কথা

বেনারস গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ

প্রণীত

প্রকাশক :—

শ্রীদুর্গাকান্ত রায়, বি. এ, বি. এল,

পেন্সন-প্রাপ্ত সব-জজ,

‘বিশুদ্ধানন্দ-কানন’—মালদহিয়া,

৺কাশীধাম।

সন ১৩৩৫ সাল।

 * [মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়,—
বিশুদ্ধাশ্রম—বর্দ্ধমান।

২। শ্রীগণপতিলাল ঝা, এম এ.,—
বিশুদ্ধানন্দ-কানন—বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট।

৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ,—
১৫।১, এলগিন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। রায়-সাহেব শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়,—
১, লাব্‌লক্ ষ্ট্রীট্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু,—
৭, কুণ্ডুরোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৬। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত,—
২, আনন্দ চাটার্জ্জি লেন, অমৃতবাজার-পত্রিকা-আফিস,
বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু। ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, বেনারস-ব্রাঞ্চ।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

পরমারাধ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবের পুণ্য প্রসঙ্গের অন্তর্গত "তত্ত্ব-কথা"র কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন সকল তত্ত্বের আলোচনা ইহাতে সন্নিবেশিত করা গেল না। ঐরূপ আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে করিতে হইলেও অন্যূন এক সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু নানা কারণে তাহা এখন সম্ভবপর নহে। অবকাশ হইলে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে যত্ন করিবার ইচ্ছা রহিল।

বর্ত্তমান খণ্ডে সাধন-জীবন-সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা কর্ম্মকুশল এবং উপলব্ধিশালী তাঁহাদিগের মতামত গ্রন্থাদির অধীন নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে চলিতে অভিজ্ঞতার উদয় হয়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়া একটি সিদ্ধান্তরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহারা শুধু যন্ত্রের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন না, তাঁহাদিগের সকলেরই আপন আপন মত আছে—এমন কি, আপন আপন পরিভাষাও আছে। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে করিতে তাঁহাদিগের পরিভাষার বিশিষ্ট অর্থ বোধগম্য হয়। মহাপুরুষগণের পরিভাষা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদিগের উপদেশকে জন-সাধারণের ও চিন্তাশীল বিদ্বজ্জনের উপযোগিবেশে উপস্থাপিত করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কঠিন হইলেও ইহা আবশ্যক। এই পারিভাষিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেক সময়ে অতি সহজ কথাও বুদ্ধ্যারূঢ় হয় না।

জগতের নিকটে বাবাজীর একটি বাণী আছে—সেটিকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা উচিত মনে হয়। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান সময়ে তাহার উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। আজ-কাল যেখানে-সেখানে 'অবতারের' উদয় দেখিতে পাই—ইহা দেশের শুভ লক্ষণ, কি তাহার বিপরীত, তাহা জানি না। কাহারও জীবনে একটু বৈশিষ্ট্য থাকিলেই তিনি অবতাররূপে গণ্য হন। অনেক স্থলে অতি সাধারণ ও গ্রাম্য প্রকৃতির লোকও স্বয়ংসিদ্ধ ভাবে অবতারত্বের দাবী করেন এবং কখনও কখনও বিশ্বাসী ভক্তের নিকটে পূজার অর্ঘ্যও প্রাপ্ত হন। ইহা কাল-মাহাত্ম্যের ফল। এই বিশ্বাসপ্রবণ দেশে বাবাজীর ন্যায় একজন অলোক-সামান্য পুরুষ আপনাকে অনায়াসেই অবতার বলিয়া প্রচারিত করিতে পারিতেন। নিরন্তর ঘনিষ্ঠরূপে সংসর্গ করিয়া তাঁহার মধ্যে যে সকল অলৌকিক শক্তির সত্তা ও লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে তাঁহার তুলনা বর্ত্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহাস্পদ মনে হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরেই ঈশ্বরত্বের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকারকে কতদিন বলিয়াছেন—"বাপু, জীব কি কখনও ঈশ্বর হয় গো? তোমরা বালক, তাই অল্পেই অভিভূত হইয়া পড়। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, জীব চিরদিন জীবই থাকে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহার মতন শত শত ব্রহ্মাণ্ড নিমেষমাত্রে সৃষ্টি সংহার করিতে পারিলেও জীব জীবই—ঈশ্বর নহে। জীব সাধনা দ্বারা মহাশক্তির প্রসাদে ঈশ্বর-সাম্য লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু তবু সে জীবই থাকে। ঐশ্বর্য্যই বল আর সমাধিই বল—কিছুতেই ভুলিও না। মহাশক্তির চরণচ্ছায়া পাইলে জীব না করিতে পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু তবু মনে রাখিও, জীব জীবই। কপটাচার করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা হয় না।" যিনি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে

মহা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যিনি সত্যসংকল্প ও যোগেশ্বর মহাপুরুষ, তিনি স্বয়ং আজও মুক্তকণ্ঠে এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন। জগতের নিকটে তাঁহার প্রধান বক্তব্য—"সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে কর্ম্ম করিতে হইবে—তাহা হইতে যথাসময়ে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম আপনিই উদিত হইবে। শুধু ভাবপ্রবণতা অথবা শুষ্ক গ্রন্থাধ্যয়নমূলক তর্ক-বিচার হইতে প্রকৃত ফললাভের আশা নাই। কর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন।" তাঁহার জীবন ও উপদেশ হইতে কয়েকটি প্রধান শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হই। তাহা এই—

(১) সদাচার প্রতিপালন। সাধনা দ্বারা যিনি যতই উন্নতি লাভ করুন, আচারের অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। নিজে আচারের অধীন না হইলেও লোক-শিক্ষার জন্য আচার পালন অত্যাবশ্যক।

(২) ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণ। তিনি বলেন—চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বগৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব যাইবার নহে। অন্যান্য জাতি সাধনা-দ্বারা উন্নত হইলেও—বিভূতি-সম্পন্ন হইলেও—ব্রাহ্মণের নমস্য নহে। অন্য জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণের প্রণাম-গ্রহণ সর্ব্বথা অবৈধ। ব্রাহ্মণের পক্ষেও কিছু বিভূতি দর্শন করিয়াই অন্যকে প্রণাম করা বা তাহার নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ অনুচিত। ব্রাহ্মণ কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেও উপাদানগত বা বীজগত মহত্ত্বে মহীয়ান্—শাস্ত্রানুকূল ভাবে সাধনা করিতে পারিলে তাঁহার দীর্ঘকালের আবরণও স্খলিত হইয়া যাইবে, তখন যথার্থ ব্রাহ্মণ-ভাব জাগিয়া উঠিবে। যজ্ঞ-সূত্র-ত্যাগ, সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিহার, যখন-তখন ফল্গু-বৈরাগ্যের অনুপ্রাণনায় কাষায়-বসন-পরিগ্রহ—এ সব ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুকরণীয় কার্য্য নহে। আদর্শ ব্রাহ্মণ হইতে পারিলে সর্ব্বজগতের আধিপত্যও তুচ্ছ মনে হয়।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিয়াও ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা যায়। আজকাল সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে যে একটা প্রবল আন্দোলন চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অনেকাংশে অমূলক ও সমাজের অপকারক। প্রকৃত সন্ন্যাস অতি দুর্লভ বস্তু—যে তাহা লাভ করিতে পারে, সে সত্যই ধন্য। বাহিরের সন্ন্যাস একটা প্রথা মাত্র। তাহার উপযোগিতা আছে, তবে তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ উর্দ্ধরেতা না হইয়া কাষায়-বস্ত্র-পরিধান অতি বিপজ্জনক ব্যাপার। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া সংযত ও সত্যপরায়ণ থাকিবে, যথাবিধি স্বীয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিবে, সদাচার পালন করিবে, ভগবানে বিশ্বাস রাখিবে ও যথাশক্তি যোগাভ্যাস করিবে—তাহা হইলে জগদম্বার কৃপায় সকল অভাবই মিটিয়া যাইবে। আর ব্রাহ্মণের বিশেষ কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

(৩) শাস্ত্রের মর্য্যাদা পালন। শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিলে কখনই ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। তবে মনে রাখিও, শাস্ত্র অনন্ত—দু' পাতা সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজেকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিও না। যোগী ভিন্ন শাস্ত্ররহস্য কেহই জানে না। অহঙ্কার পতনের মূল—বিনয় জ্ঞানীর ভূষণ। মহাপুরুষগণও লোক-ব্যবহারে শাস্ত্র মানিয়া চলেন। তাঁহারা শাস্ত্রের অতীত—তথাপি সমাজ-রক্ষার জন্য বিধি-নিষেধ অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যতদিন অন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎ বাণী শ্রুতিগোচর না হইবে, যতদিন অন্তরাত্মার প্রেরণায় চালিত না হইতে পারিবে, ততদিন বাহ্য শাস্ত্রের অনুসরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন শাস্ত্রেরই অমর্য্যাদা করিতে নাই—সবই অধিকারানুসারে প্রামাণিক।

(৪) সর্ব্বদেবে সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন। দেবতায় ভেদবুদ্ধি ভগবৎ-কৃপালাভের অন্তরায়। কর্ম্ম-কালে আপন আপন ইষ্টে নিষ্ঠা রাখিবে, জ্ঞানতঃ সর্ব্ব দেবতাকে সমান বলিয়া ধারণা করিবে। সব দেবতাই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। কিন্তু জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সকলকেই আপন আপন ইষ্টপথেই চলিতে হইবে। তাহাতেই পূর্ণতালাভ হইবে। সুতরাং দেবতত্ত্ববিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষ-বিচার মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। যাহার যাহা স্বীয় ভূমি, তাহাকে তাহাতেই অবস্থিত হইতে হইবে, কাহারও সাধন-পদ্ধতি বা আচরণের নিন্দা করিবে না।

(৫) অভ্যাস-যোগ। আলস্য ত্যাগ করিয়া গুরু-নির্দ্দিষ্ট সাধন-ক্রমের অভ্যাস করিবে। অভ্যাসের মাহাত্ম্য অনন্ত। তপস্যার ফলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

(৬) চরিত্রের বিশুদ্ধি। সকল প্রকার উন্নতিই চরিত্রের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। কাহারও মনে আঘাত দিবে না, ইন্দ্রিয় জয় করিবে, কায় মনঃ ও বাক্যে সত্য পালন করিবে, গুরুতে অচল শ্রদ্ধা রাখিবে, ধৈর্য্য ক্ষমা ও করুণাবৃত্তির অনুশীলন করিবে, চিত্ত সর্ব্বদাই অনাসক্ত ও প্রশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য।

(৭) আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দার পরিহার। কখনও নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিবে না ও অন্যের নিন্দা করিবে না। অন্যের কার্য্যের ভাল-মন্দ-বিচার অবৈধ। কে কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে বিচারের অধিকার অন্য কাহারও নাই। সাধু-সজ্জনের নিন্দা বা তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা ও দেব-চরিত্রের সমালোচনা একান্ত গর্হিত। সরলভাবে আত্মদোষের অন্বেষণ করিবে ও সংশোধনের চেষ্টা

করিবে। কপটতার আশ্রয় কখনই গ্রহণ করিবে না। সকল দোষেরই ক্ষমা আছে, অহংকার ও কাপট্যের ক্ষমা নাই।

(৮) মনুষ্যে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ। মনুষ্য ঈশ্বর না হইতে পারিলেও ঈশ্বরভাবাপন্ন হইতে পারে—ঐশ্বরিক শক্তির স্ফূর্তি তাহাতে হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অবতার মনে করা উচিত নহে। ঈশ্বর যখন অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের ন্যায় (বা অন্য জীবের ন্যায়) প্রকাশিত হন, তখনও যেমন তিনি মনুষ্য (বা অন্য জীব মাত্র) নহেন, কিন্তু মনুষ্যভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরই, তদ্রূপ মনুষ্যও ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত হইলেও মনুষ্যই থাকে, সত্যসত্য ঈশ্বর হয় না। বাস্তবিক পক্ষে অবতারকে মনুষ্য মনে করা যেমন অন্যায়, তেমনই মনুষ্যকে অবতার মনে করাও অন্যায়।

জগতের সমক্ষে ইহাই বাবাজীর সাধারণ বাণী। বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ উপদেশ অবশ্য এখানে আলোচ্য নহে।

"বিশুদ্ধানন্দ-কানন"
৺কাশীধাম।
৺শিবরাত্রি, ১৩৩৫।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	শঙ্করাচার্য্য	শঙ্করাচার্য্য
৮	১০	যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে	যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে
১২	৩	•শোপোদ্বলমার্থ•	•শোপোদ্বলনার্থ•
১৭	৭	চিত্তে রসংশয়	চিত্তের সংশয়
৮৮	১১	অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য-যোগীর	অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য—যোগীর
১২১	১৫	এই বিশ্ব-দর্পণ-দৃশ্যমান	এই বিশ্ব দর্পণ-দৃশ্যমান

নবরত্নমালা

নীলোন্মীলদমন্দসৌরভভরাম্ভোজালিতুল্যশ্রিয়ং
কায়ং কাশকুলপ্রকাশবিশদং কূর্চ্চং বহন্তং পৃথুম্।
অক্ষিভ্যাং শরদিন্দুমুগ্ধমধুরজ্যোৎস্নাঞ্চিতাভ্যাং চিরং
বর্ষন্তং করুণারসং, গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথং ভজে ॥ ১ ॥

ভ্রূক্ষেপক্ষপিতাতিকশ্মলমিলত্তেজঃপ্রকর্ষোজ্জ্বলং
প্রহ্বং শিষ্যজনং ক্ষণাদধিপতিং সিদ্ধের্বিধায় ধ্রুবম্।
সোপেক্ষং পরিলক্ষয়ন্নপি মহাসিদ্ধিং, স বো ভূতয়ে
ভূয়াৎ কোঽপ্যতিসিদ্ধিমান্ গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথঃ সদা॥ ২ ॥

কস্তূরীঘনসারসৌরভকৃতোপাদানমুচ্চৈর্বপু-
র্নিঃসংখ্যৈঃ স্ফটিকৈরশূন্যমপি তচ্ছূন্যং বিচিত্রং বহন্।
পীযূষাদধিকং ধয়ন্নবিরতং স্তন্যং তত্ত্বৎসঙ্গগঃ
শ্রীমাতুর্জরঠঃ শিশুর্গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোঽবতু ॥ ৩ ॥

ষট্‌চক্রক্রমভেদনেঽপ্যবিদিতং নৈকৈর্মহাযোগিভি-
র্নাভীধৌতিকিরাতকুম্ভকবিধিং সাধ্যং ন সাধারণৈঃ।
শিষ্যেভ্যঃ সদয়ং প্রদায় সরলং পন্থানমপ্যাদিশন্
পায়াদ্বঃ করুণার্ণবো গুরুবিশুদ্ধানন্দনাথোঽনিশম্ ॥ ৪ ॥

একে কর্ম্মসমুৎসুকাঃ কতিপয়ে জ্ঞানৈকবদ্ধাদরা
ভক্ত্যাঽন্যে পরমাত্মনোংশমমলং ভিন্নং লভন্তে মিথঃ।
যদ্ভক্তাস্ত্রিতয়ীসমুচ্চয়পথাঃ পূর্ণং লভন্তে শিবং
পূর্ণাত্মা তনুতাং স্বতাং ময়ি বিশুদ্ধানন্দনাথো গুরুঃ ॥ ৫ ॥

জগন্মাতুঃ ক্রোড়ে বসতিমনিমেষং বিদধতা
রহস্যং লীলায়াঃ কলিতমখিলং যেন কুতুকাৎ।
ততো ভক্তব্রাতে সদয়মনসা তচ্চ বিততং
বিশুদ্ধানন্দোঽসৌ জয়তি যতিরাজঃ শিববপুঃ ॥ ৬ ॥

যমালোক্যোৎসুক্যাজ্জলধিমিব শান্তোর্ম্মিমুদয়-
দ্দয়াসারং চেতঃ সপদি ভজতে শান্তিমতুলাম্।
যদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বস্যাশ্রয়ণমখিলার্থপ্রদমতো
বিশুদ্ধানন্দং তং শরণমুপযামো গুরুবরম্ ॥ ৭ ॥

জগন্মাতুঃ পাতুং স্তনজমমৃতং বাঞ্ছতি চিরা-
দপীতং ব্রহ্মাদ্যৈর্ম্মম কিল মনো দুর্ললিতকম্।
বিশুদ্ধানন্দেশ! প্রণতজনকল্পদ্রুম! গুরো!
কৃপাপাঙ্গালোকৈর্ঝটিতি তদভীষ্টং সুঘটয়েঃ ॥ ৮ ॥

জয়তি বিজিতভূতঃ কালমাক্রম্য তিষ্ঠন্
কলিতবিমলযোগঃ সৌরভাণাং নিধানম্।
অতুলিতকরুণায়াঃ সাগরঃ সর্ব্ববেত্তা
গুরুবরস্তবিশুদ্ধানন্দনাথো যতীন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ

তত্ত্ব-কথা।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকা।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে জগতের আধ্যাত্মিক আন্দোলনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্ধান রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, আজকাল অনেক সরল ও চিন্তাশীল মনুষ্যের হৃদয়েই আত্মিক উন্নতির জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী মোহ-নিদ্রার মধ্যে এখন একটু জাগরণের পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে। নিদ্রার অবসান না হইলেও উহার গভীরতা কিয়দংশে কাটিয়া গিয়াছে, সেই জন্য এখন অনেকের মুখেই ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—অনেকেই এখন জীবনের প্রচলিত ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি হইবে? নিজের চিরাভ্যস্ত কর্ম্মজনিত সংস্কার তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। আপ্ত মহাপুরুষের সঙ্গ ও সাহায্য না পাইলে পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সত্যপথে সঞ্চরণ করা বড় কঠিন। কারণ, সত্যলাভের পথ ক্ষুরধারার ন্যায় অতি দুর্গম—"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" কঠোর তপস্যা ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, অদম্য অধ্যবসায়, সরল ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়, তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, নির্ম্মল বৈরাগ্য—এই সকল সদ্‌গুণের যথোচিত অনুশীলন না হইলে সত্যোপলব্ধির বাধা দূরীভূত হয় না। গুরুকৃপাবলে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে জয়ী হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষা এবং মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, সংসারে এই তিনটি অতি দুর্লভ পদার্থ। চৌরাশী কোটী জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উপাদানের ক্রমিক উৎকর্ষলাভ করিতে করিতে মনুষ্য-দেহ প্রাপ্তির অধিকার জন্মে, কিন্তু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক মুক্তির কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিবার ইচ্ছা সকলের হয় না। আর ইচ্ছা হইলেও পথপ্রদর্শক ও শক্তিদাতা গুরুর শরণাপন্ন না হইতে পারিলে পূর্ণ সিদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষদর্শী বিভূতিসম্পন্ন আপ্তপুরুষ চিরদিনই সংসারে বিরল—বর্ত্তমান সময়ে কাল-মাহাত্ম্যে ইহা আরও অধিকতর বিরল হইয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং উন্নতিলিপ্সু মনুষ্যের পক্ষে আজকাল অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা সত্ত্বেও সৎপথে চলিয়া সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উৎকট পিপাসার সময় যেমন কোনও ব্যক্তি পানীয় জলের গুণাগুণ নির্ণয়ের অবকাশ পায় না, যে জল প্রথমে হস্তগত হয় তাহা সর্ব্বথা বিশুদ্ধ না হইলেও তাহার দ্বারাই পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করে, সেই প্রকার বর্ত্তমান সময়ে আগ্রহশীল সাধনার্থী যোগ্যতার বিচার না করিয়াই যে কোনও স্থানে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হয় সেখানেই মস্তক অবনত করিয়া জিজ্ঞাসুরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও নবীন নানা প্রকার পুস্তক, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ, অল্পজ্ঞ ও অদূরদর্শী লেখকগণের অসার ও ভিত্তিহীন নিবন্ধ—এই সকল উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বহু লোকে নিজের সংশয়ভঞ্জন করিয়া গন্তব্যপথের নিরূপণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে বিষময় পরিণাম অনিবার্য্য। কার্য্যক্ষেত্রে বহুস্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থের উপদেশ অনুসারে সাধক আপন সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যদি তত্ত্বদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাত্মাও হন, তাহা হইলেও কেবল মাত্র তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ কোনও দিন সাধনমার্গে যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। উপদেশ কিম্বা বর্ণনা চিরদিনই অসম্পূর্ণ;

থাকে। মহাজন ধর্ম্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মজীবনে উহার পরিণাম এবং বিকাশ সম্পাদন পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহার ধর্ম্মময় জীবনের মধ্য দিয়াই সূক্ষ্ম ও জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া থাকে। মহাজনের উপলব্ধি এবং উপদেশ এই জন্যই বিশেষভাবে আলোচনীয়।

যাঁহারা সাধন-পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সত্যনির্ণয়ের যাবতীয় উপায়েরই সহকারিতা গ্রহণ করিতে হয়। গুরূপদিষ্ট মার্গে, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার সহিত নিরলসভাবে চলিতে চলিতে সকল তত্ত্বই জানিতে পারা যায় এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেও পাওয়া যায়। তখন নিজের উপলব্ধির সহিত এক দিকে গুরু, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষের বাক্য ও অপরদিকে নিজের শুদ্ধ বিচার, এই উভয়ের সম্মিলন করিয়া উপলব্ধির প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই ত্রিবিধ উপায়ে সত্যবস্তুর সত্যতা সাধকের নিকট পরীক্ষিত হইয়া থাকে,—কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অথবা যুক্তি অথবা শাস্ত্র বা মহাপুরুষের উপদেশ সন্দেহ এবং বিপরীত ভাবনাগ্রস্ত মনুষ্যের পক্ষে সত্যাসত্য নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত সাধন নহে। যতদিন আমাদের মন সংস্কারের অধীন থাকে, ততদিন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ হইতে সত্যনির্ণয় হয় না। সত্যের যাহা নির্ম্মল ও সার্ব্বভৌম স্বরূপ, তাহা সংস্কাররঞ্জিত চিত্তের সম্মুখে বিকৃতরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সুতরাং

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংস্কারের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অভ্রান্তরূপে সত্যের নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। দেহ ও বিষয়সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা এবং স্থূলজগতে ক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষজনিত দৈহিক অসামঞ্জস্য—এই সকল কারণেও লৌকিক প্রত্যক্ষ অনেক সময় মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই জন্য সাধনাবস্থায় প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় আবশ্যক। সর্ব্বদা সচেতন থাকিয়া নিজের অনুভূতিকেও বিচারের কঠোর মানদণ্ডে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহাতেও নিঃসংশয় জ্ঞানের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, সাধনাবস্থায় নানা কারণে প্রত্যক্ষে যেমন দোষ থাকিতে পারে, তেমনি বিচারেও ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। সে-স্থলে প্রত্যক্ষ ও যুক্তির সামঞ্জস্যসত্ত্বেও তত্ত্বের স্বরূপসম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জন হয় না। বিশেষতঃ, যে সকল বিষয় অসংস্কৃত মন এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাদিগের সম্বন্ধে তথ্য-নির্দ্ধারণ সিদ্ধ মহাত্মাদের অভ্রান্ত উপলব্ধিমূলক উপদেশের সহায়তা ভিন্ন হইতে পারে না। যিনি যত বড় সাধক অথবা বিচারশীল পুরুষই হউন না কেন, তাঁহাকেও অবশ্যই সিদ্ধ মহাজনের বাণী অথবা শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন করিয়া নিজের অনুভব ও বিচারের মূল্য নিরূপণ করিতে হয়।

এইপ্রকারে কেবলমাত্র যুক্তি দ্বারাও সত্যের রূপ নিশ্চয় করা যায় না। যে যুক্তি প্রত্যক্ষে প্রতিষ্ঠিত নহে,

প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহার সমর্থন হয় না, যাহা শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের বিরোধী—তাহা সদ্‌যুক্তি নহে, যুক্তির আভাস মাত্র, তাহা দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় কোনই উপকার হয় না। এইজন্যই বেদান্তাদি শাস্ত্রে তর্কের অপ্রতিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এত সমালোচনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রমূলক তর্কই সত্তর্ক, শাস্ত্র এবং মহাপুরুষের নির্ম্মল অনুভূতিকে আশ্রয় না করিয়া যে তর্ক প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কুতর্ক ভিন্ন অন্য কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ঋষি-বাক্যে আছে—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কই সত্তর্ক। "যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে," ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কুতর্ক অথবা শাস্ত্রের অননুমোদিত বিচার তত্ত্ব-নির্ণয়ের সহায়ক নহে। যাহারা শুষ্ক যুক্তিবাদী অথবা rationalist, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ এবং বিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া যুক্তির বৈধতা ঠিক করিতে হয়। যুক্তি অনুভবমূলক—যাহার অনুভবের রাজ্য যে পরিমাণে বিস্তৃত, তাহার যুক্তি সেই পরিমাণে বলবতী। যতদিন অনুভব সর্ব্বব্যাপক না হইবে, যতদিন নানা প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকের দ্বারা অনুভবের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ঐ প্রকার অনুভব-মূলক যুক্তিও স্থিরতা লাভ করিতে পারিবে না। জ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ষের অনুপাতে যুক্তির

আপেক্ষিক বলবত্তা নিয়মিত হয়। বালক তাহার ক্ষুদ্র অনুভবের বলে যাহা যুক্তিসঙ্গত মনে করে, যৌবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যুবক তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রকার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষের সমন্বয় আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, তাহার সঙ্গে বিশুদ্ধ অনুভবের তুলনা করিয়া সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হয়। অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ সংশয়বাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদ যে অধিকতর উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যুক্তিবাদের যাহা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা, তাহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে যুক্তির অযথা প্রাবল্য ধর্ম্মালোচনার বাধাই উৎপাদন করে।

প্রত্যক্ষ ও যুক্তির ন্যায় শুধু শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারাও সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র-বাক্য কিম্বা মহাপুরুষের উপদেশ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে নির্দ্দোষ বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষের দ্বারা উহার প্রামাণ্য পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ, যাঁহার কোনও প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই এবং যিনি বিচারশীল নহেন, তিনি শাস্ত্রোপদেশ বুঝিবার অধিকারী নহেন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার পরস্পর সমন্বয় ভিন্ন কোনও উপদেশই যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া ক্রিয়ার দ্বারা আয়ত্ত

করিতে না পারিলে উপদেশের সার্থকতা সম্পন্ন হইতে পারে না। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের অপরোক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই অনুভূতি বিশ্লেষণ করিয়া দেশ কাল ও পাত্রের উপযোগী বেশে অধিকার অনুসারে তাঁহারা জগৎ সমক্ষে প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্র। যাঁহারা ঋষিগণের এই অবলম্বিত পথ আশ্রয় করিয়া তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে অগ্রসর হন, তাঁহারা ক্রমশঃ জ্ঞান ও ক্রিয়ার আবরণ অপসারিত করিয়া সত্যোপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় শাস্ত্র-বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং পক্ষান্তরে নিজের অনুভূতিও শাস্ত্রানুরূপ বলিয়া সত্যরূপে প্রতিভাত হয় ও তাহাতে দৃঢ় আস্থা উৎপন্ন হয়। তখন বিচারশক্তি এই অনুভূতি ও শাস্ত্রবাক্যের অনুকূলরূপে স্বতঃই কার্য্য করিতে থাকে। শাস্ত্রের কথা যে শুদ্ধ কথা-মাত্র নহে, তাহার মূলে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, এই সকল বিষয় বাহির হইতে উপলব্ধি করা যায় না। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। পঞ্চীকরণের প্রণালী বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে—অপঞ্চীকৃত ভূত অথবা তন্মাত্রা পঞ্চীকৃত না হইলে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি হইতে বর্ত্তমানকালের নবীন বৈদান্তিক পর্য্যন্ত বহু আচার্য্যই পঞ্চীকরণের প্রণালী

সম্বন্ধে আপন আপন ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকল প্রণালী সত্যরূপে সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই অনুভব করিতে পারেন না। একটি নির্দ্দিষ্ট আম এবং জামকে বিশ্লেষণ করিয়া যদি আমি অপঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূতের সমাবেশ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পঞ্চীকরণ-বিষয়ক জ্ঞান কিছুই হয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। তন্মাত্রা সাক্ষাৎকার, তন্মাত্রার পরস্পর সংযোগের নিয়ম ও প্রণালীর জ্ঞান, ক্রিয়াশক্তির দ্বারা নিজে উক্ত প্রণালী আয়ত্ত করা—এই সকল উপায়ে পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার তাহা হয় নাই, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের স্বরূপ ও পরস্পর প্রভেদ প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন নাই, তিনি পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন না। শাস্ত্রে এই বিষয়ে যেখানে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি তাহা কি বুঝিতে পারিবেন? শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সকল লোক এবং লোকবাসী প্রাণীর দেহ পঞ্চীকৃত ভূতের দ্বারা উৎপন্ন, অথচ ভূলোকবাসী মনুষ্যাদির দেহের সহিত স্বর্গ প্রভৃতি ঊর্দ্ধলোকনিবাসী দেবগণের দেহের যে স্বভাবসিদ্ধ বৈলক্ষণ্য আছে তাহাও সত্য। পঞ্চীকরণ ব্যাপারের প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকিলে এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় উপদেশ ঠিক ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গ অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রানুশীলন করিয়াও

যে শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে পারেন না, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। যোগভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"তস্মাৎ শাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশোপোদ্বলমার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশপ্রত্যক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে।" শাস্ত্র বা আচার্য্যের উপদেশ সত্য হইলেও যতদিন কিছু প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিন উহাতে সম্যক্ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বিচারের যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ যুক্তি এবং শাস্ত্র বা মহাপুরুষের বাক্য, সত্য বা ধর্ম্ম নির্ণয়ের পক্ষে তিনেরই সমরূপে উপযোগিতা রহিয়াছে। মহাজনগণের উপলব্ধির বর্ণনা ও উপদেশাদি এই জন্য কর্ম্মী ও বিচারশীল সাধকের নিকটে আত্মসাধনার সহায়ক-রূপে সমাদৃত হয়। শাস্ত্র-বাক্য, মহাপুরুষের বচন ও সদ্‌গুরু-বাক্য—তিনের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। কারণ, তিনটিই আপ্তবচন ও অভ্রান্ত। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ইহাদের আপেক্ষিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাস্ত্র কিম্বা মহাজনের বাক্য প্রধানরূপে গ্রাহ্য, কিন্তু সদ্‌গুরুলাভের পরে উহাদের প্রাধান্য থাকে না। তখন গুরুবাক্যই একমাত্র নিয়ামক। বাস্তবিক পক্ষে সদ্‌গুরুর উপদেশ

শাস্ত্রবাক্য বা মহাপুরুষের বচন হইতে কোনও অংশে ভিন্ন না হইলেও উহা সাধকের ব্যক্তিগত অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া কর্ম্ম-প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য এবং উহাতে নিষ্ঠা দৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা এবং মহাজনগণের চরিত ও উপদেশাদির আলোচনাও আবশ্যক।

আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্য প্রসঙ্গের আলোচনার অঙ্গরূপে এই তত্ত্ব-কথার অবতারণা করিতেছি, তিনিই ইহার প্রাণস্বরূপ। সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং পরোক্ষে, স্থূল শব্দের আশ্রয়ে এবং অনৌপদেশিক প্রাতিভ জ্ঞানরূপে, শুদ্ধ উপদেশচ্ছলে অথবা জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, তিনি যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই অতিক্ষুদ্র একদেশ মাত্র বর্ত্তমান আলোচনায় প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সদ্‌গুরু শিষ্যকে অসংখ্য উপায়ে উপদেশ দিয়া থাকেন—শুধু বাক্য-প্রয়োগের দ্বারাই যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা নহে। অনেক সময়ে বাহ্যদৃষ্টিতে মৌন অবলম্বন করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে বোধ রূপে উদিত না হইলে চিত্তের দৃঢ়মূল সংশয় শুধু শুদ্ধ যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা বিদূরিত করা যায় না। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ—ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। চৈতন্যরূপী গুরু মনোদর্পণে চিদালোক সঞ্চার না করিলে মনের চাঞ্চল্যরূপ

সংশয় এবং আবরণরূপ মিথ্যাজ্ঞান কখনই দূর হইতে পারে না। এই শক্তির সংক্রমণ বৈখরী বা স্থূল শব্দকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে, এবং না করিয়াও হইতে পারে। উচ্চতর ভূমির জ্ঞানের প্রকাশ সম্বন্ধে স্থূল শব্দের কোনই কার্য্যকারিতা নাই, উহা সাক্ষাদ্‌ভাবে গুরুশক্তির প্রভাবে হৃদয় হইতে আবির্ভূত হয়। সাধকের চিত্তগত অবস্থা অনুসারে জ্ঞানের অবতারণাও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। জ্ঞান নির্ম্মল হইলেও আধারের মলিনতা বশতঃ প্রকাশিত হইবার সময়ে অল্পাধিক মলিন ও বিকৃত রূপ ধারণ করে। সেটা জ্ঞানের দোষ নহে—আধারেরই দোষ। বর্ত্তমান স্থলেও তাহাই মনে করিয়া প্রকাশগত অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজ্যের আনুষঙ্গিক কতিপয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বাবাজীর মতামত এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার তত্ত্বব্যাখ্যা-প্রণালীর মাধুর্য্য কেহ আস্বাদন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি খণ্ড পুষ্প হইতে যেমন পুষ্পবনের অখণ্ড মাধুরী ও সুষমা অনুভূত হয় না, সেই প্রকার মহাপুরুষের জীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিহার করিয়া শুধু তাঁহার উপদেশ হইতে তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাবাজীর তত্ত্বব্যাখ্যা-প্রণালীতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পাইবার সম্ভাবনা

নাই। তিনি যখন যে উপদেশ দান করেন অথবা যে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক যুক্তি-সহকারে ব্যাখ্যা করেন, প্রয়োজন হইলে এবং অধিকারানুসারে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন। ইহার ফলে শ্রোতার মনে ব্যাখ্যাত তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত হইয়া যায়। গ্রন্থ পাঠ হইতে এই সকল সৌকর্য্য পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, তথাপি শক্তিমান্ মহাত্মার উপলব্ধির দিক্ হইতে তত্ত্বকথার আলোচনারও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আশা করি এই প্রকার আলোচনাও একেবারে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ কি চায়?

জিজ্ঞাসু। বাবা, আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। অনেক দিন হইতে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, ইহার সমাধান না হইলে আমার চিত্তের শান্তি নাই। প্রশ্নটি আর কিছু নহে—মানুষের জ্ঞেয় বস্তু কি, তাহারই স্বরূপ নির্দ্ধারণ। সংসারে জ্ঞানের বিষয় বহু দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে প্রকার রুচি ও প্রবৃত্তি, সে সেই প্রকারেই জ্ঞানের অন্বেষণে তৎপর থাকে—কিন্তু জ্ঞানের অন্বেষণ করিয়াও কাহাকেও পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে জানিবার বিষয় অনন্ত রহিয়াছে। জানিতে গিয়া জানার অন্ত পাওয়া যায় না, জ্ঞান-পিপাসাও নিবৃত্ত হয় না। তাই মনে হয়, মানুষের আপন জ্ঞেয় পদার্থের সহিত পরিচয় নাই।

বক্তা। বৎস, তুমি সত্যই বলিয়াছ, মানুষ জানে না তাহার জ্ঞানের বিষয় কি। যদি তাহা জানিত ও জানিয়া তাহার অনুসন্ধান করিত, তাহা হইলে এক দিন না এক দিন সে নিশ্চয়ই সফলকাম হইত। যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকী থাকে না, তাহাই

জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়। তাহাকে বাদ দিয়া আর যাহাই জানিতে চেষ্টা কর, চেষ্টামাত্রই সার হইবে। কায়াকে বাদ দিয়া ছায়া জানিবার উদ্যম বিচারশীল মনুষ্যের পক্ষে হাস্যাস্পদ নহে কি?

জি। তাহা হইলে মানুষের যথার্থ প্রশ্ন কি? এমন কি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর না পাইলে তাহার সংশয়াকুল চিত্তে রসংশয় কখনই দূরীভূত হইবে না?—জগতের সমগ্র জ্ঞান-সম্পৎ ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হইলেও তাহার চিত্ত শান্তিলাভ করিবে না?

ব। মানুষ বস্তুতঃ কি চায় ও কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহা লাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার যথার্থ প্রশ্ন। মানুষের পুরুষার্থ কি ও তাহার সাধন কি—অজ্ঞানী এবং উৎপথগামী জীবের পক্ষে ইহাই প্রথম ও প্রধান জিজ্ঞাস্য। এই জিজ্ঞাসাকে হৃদয়ে জাগরূক না রাখিয়া তুমি অন্য যাহা কিছু জানিতে চেষ্টা কর, জানিবার আকাঙ্ক্ষা কখনই নিবৃত্ত হইবে না।

জি। মানুষ কি চায়, তাহা কি সে জানে না? আমার ত মনে হয়, যে যাহা চায় সে তাহা জানে—জানে বলিয়াই তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে। কেহ ধন চায়, কেহ যশঃ চায়, কেহ রূপ চায়, কেহ বা ভোগ-বিলাস চায়—সকলেই যে এক বস্তুই চায়, এমন নহে। তবে যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহার

জন্যই সে উদ্যম করে। অপ্রার্থনীয় বস্তুর জন্য উন্মত্ত ভিন্ন কে পরিশ্রম করিয়া থাকে?

ব। মোহ-বিকারে আচ্ছন্ন মনুষ্য উন্মত্তভাবেই ত চলিয়াছে। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও বিচার সহকারে জগতের অবস্থাটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সব বুঝিতে পারিবে। মানুষ নিজেও নিজের প্রার্থনীয় বিষয় জানে না ও তাহার উপলব্ধির সাধন কি, তাহার সন্ধান রাখে না। যদি জানিত, তাহা হইলে তাহার এ দশা হইত না। তাহা হইলে সে চঞ্চল হইয়া হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিত না। কিসের তাড়নায়, কোন্ মহারত্নের অন্বেষণে, জীব এত কাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?—কিসের জন্য সে এই প্রকার দুর্গম অরণ্য, বিশাল মরু-কান্তার, তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখর, চির-তমসাচ্ছন্ন পাতালগহ্বর, অপার সমুদ্র-গর্ভ ভেদ করিয়া চলিয়াছে?—দিবসের কর্ম্মজালে, নিশীথের মহা-সুষুপ্তিতে, কখনও নিঃসঙ্গ একাকী, কখনও বা জন-সঙ্ঘের কোলাহলে, সুদূরের তীর্থযাত্রীর ন্যায় সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উদাস প্রাণে বিভোর মনে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে? উত্থানে পতনে, শয়নে জাগরণে, সুখে দুঃখে, পাপে পুণ্যে, কোন্ অপূর্ব্ব স্বপ্নময়ী আশা তাহাকে চালিত করিতেছে? মানুষ জীবন-ভোর খুঁজিয়া ফিরিতেছে,

কিন্তু কি খুঁজিতেছে তাহা সে জানে না। সে মনে করে, ধন তাহার কাম্যবস্তু, কিন্তু ধন পাইয়াও তাহার তৃপ্তি হয় না। তখন আরও অধিক ধন আকাঙ্ক্ষা করে, অথবা হয়ত তাহার ধনের আকাঙ্ক্ষা পুত্রাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু পুত্রলাভ করিলেই যে তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, তাহা নহে। তখন আবার যশোলিপ্সা তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তোলে। আসল কথা, তাহার প্রার্থনীয় কি, তাহা সে নিজেই জানে না। ব্যাপারটি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ইহা সত্য। মানুষের এই অশান্তির মূলে যে একটি গভীর অভাব রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধন, জন, যশঃ, ভোগ বা রূপ—যাহা কিছু বল, কিছুরই অভাব প্রকৃত অভাব নহে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রাণের অভাব মিটে না। আর সত্য সত্য সে যাহা চায় বলিয়া মনে করে তাহাও সে পায় না। তাহার চাওয়া ও পাওয়া উভয়ই বাস্তবিক পক্ষে ভ্রান্তির বিলাস মাত্র। মানুষ এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে নাট্যলীলাসূত্রে অনাদিকাল হইতে কতবার কত বেশ গ্রহণ করিয়াছে ও ত্যাগ করিয়াছে, তাহা এই চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া সমন্বয় স্থাপনের জন্য। নরকের কীট হইতে ব্রহ্মলোকের আধিপত্য পর্য্যন্ত যাবতীয় অবস্থা সে অনুভব করিয়া দেখিয়াছে,

কিন্তু তাহার অভাব-নিবৃত্তি হয় নাই। যুগে-যুগান্তরে লোকে-লোকান্তরে কত জন্ম ব্যাপিয়া তাহার সাধনা চলিয়াছে, কিন্তু সে "পাইয়াছি" বলিয়া এখনও শান্ত হইতে পারে নাই। যাহা পাইলে সব পাওয়ার আশা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়, সেই চিন্তামণি-ধন এখনও সে পায় নাই।

জি। বাবা, সত্যই এমন কোন বস্তু আছে কি, যাহা পাইলে আর-কিছু পাইবার জন্য ইচ্ছা জাগিবে না, যাহা পাইলে পরমানন্দ ও পরম শান্তির উপলব্ধি হইবে?

ব। হাঁ, আছে বই কি? আছে বলিয়াই ত আজও সংসারে শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ক্ষীণ আভা দেখিতে পাও, তাই অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারেও জ্ঞানের প্রভা একেবারে লুপ্ত হয় না, সেই জন্যই মৃত্যু-রাজ্যে বাস করিয়াও নিরন্তর কালের প্রবল প্রতাপ অনুভব করিয়াও—মানুষের হৃদয় অন্তরে অন্তরে অমৃতের জন্য লালায়িত হয়? তুমি কি মনে কর, মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা অমূলক ও অসার? তাহা মনে করিও না। সত্যই এমন বস্তু আছে, যাহা পাইলে সব সাধ মিটে, সব কামনা তৃপ্ত হয়, সব আশা সফল হয়। যে যাহা চায়, ভুল করিয়া চায়—বাস্তবিক সেই বস্তুই সকলে চায়। দীনের ঐশ্বর্য্য-লালসা, বদ্ধের

মুক্তি-কামনা রূপানুরাগীর রূপ-তৃষ্ণা, কামুকের কাম-পিপাসা, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলিপ্সা—যাহার যে আকাঙ্ক্ষাই থাকুক, সেই এক আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। বৎস, যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, যে জগতের অন্তর্নিহিত নিবিড় বেদনার অনুভূতিতে বিবশ হইয়াছে, তাহাকে সংসারের আড়ম্বর ও ভোগ-বিলাসে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যদি মানুষের কিছু জানিবার থাকে, তবে ইহাই প্রথম ও প্রধান। মানুষ যাহা চায়, তাহাই তাহার পুরুষার্থ, যে উপায়ে পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় তাহাই উহার সাধন।

জি। বাবা, তাহা হইলে ঐ পুরুষার্থ কি? শাস্ত্রে নানা স্থানে নানা কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল মতে বস্তুতঃ বিরোধ না থাকিলেও আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। তাই এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত মত কি, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি।

ব। মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বভাবের উপলব্ধি। জীব স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়াই দুঃখের কূপে নিপতিত হইয়াছে। পুনরায় সাধনা প্রভৃতি দ্বারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহার যাবতীয় অভাব মিটিয়া যাইবে। যাহাকে পরমানন্দ ও পরম শান্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা বস্তুতঃ স্বভাবে

অবস্থানের পূর্ব্বাভাস ভিন্ন অপর কিছু নহে। শাস্ত্রে পরম-পদসম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা এই অবস্থা সম্বন্ধে বেশ খাটে। তবে শাস্ত্রের বর্ণনা পূর্ণ সত্যের জ্ঞাপক নহে। যিনি যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ততটুকুই ভাষা-মুখে উপদেশরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। যিনি যুক্তাবস্থায় পূর্ণ সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিও উপদেশ দান ও গ্রন্থ-নির্ম্মাণ কালে আপন আপন চিত্তগত সংস্কার ও বুদ্ধিশক্তির প্রকাশানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। সেই জন্য উপলব্ধিতে অভেদ থাকিলেও বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভেদ আসিয়া পড়িয়াছে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া প্রকট করিতে গেলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। অসীম বস্তু সীমার নিগড়ে কখনই আবদ্ধ হইতে পারে না। যাহা সীমাতে আবদ্ধ হয়, তাহা অসীম নয়। অপরোক্ষ-তত্ত্ব ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না।

আবরণ-নিবৃত্তি মুক্তির নামান্তর। যে আবরণে আচ্ছন্ন থাকিয়া স্থূলভাবে অভিনিবিষ্ট আছ, যখন সেই আবরণ অপগত হইবে, তখন তুমি সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে, অর্থাৎ তুমি নিজেকে সূক্ষ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং সকল পদার্থেরই

সূক্ষ্মাবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে। স্থূলভাবের নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। স্থূলের সঙ্গ হইতে প্রিয়াপ্রিয়-বোধ জাগে, অথবা সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। স্থূল-সম্বন্ধ না থাকিলে সুখদুঃখ-বোধ বা যাহাকে প্রচলিত ভাষায় 'ভোগ' বলে, তাহা থাকে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই অবস্থাতেও স্বভাবের স্ফুরণ হয় না। তখনও অভাব থাকে—অবশ্য সে অভাব তোমাদের এই পৃথিবীর অভাবের মতন নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাই যে একমাত্র অভাব তাহা নহে—তাহা বিশেষভাবে না থাকিলেও অন্যজাতীয় অভাব থাকে। এই স্তরও ভেদ করিয়া উঠিলে পরমানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। ইহাকেই ভক্তগণ প্রেম বা অমৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা বৈষয়িক সুখের ন্যায় মোহক নহে, তবুও মোহময়। একটা নিবিড় ও গভীর আনন্দ ভিন্ন এখানে আর কিছুরই অনুভব পাওয়া যায় না। এই অবস্থা পর্য্যন্ত আয়ত্ত হইলে স্বভাব প্রাপ্ত হইতে আর বিশেষ বিলম্ব হয় না। বস্তুতঃ, এই প্রেমেই স্বভাবে স্থিতি হয়। স্বভাবে স্থিতি কি প্রকার, তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না। যাহার সে অবস্থা জাগিয়াছে, সেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। অন্যকে তাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার

প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। জীব মাত্রেরই তাহাই লক্ষ্য,—তাহাই পরম পুরুষার্থ। তাহার জন্যই চেষ্টা করিতে হয়। বৎস, এই বাহ্যজগৎ হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হও, পরে তাহাও ত্যাগ করিয়া ভিতর-বাহির সমান করিতে চেষ্টা কর। যখন তাহা পারিবে, তখন সেই অদ্বৈতরূপিণী মাতার স্নেহ-শীতল অঙ্কে স্থান লাভ করিয়া ধন্য হইবে। শিশু হইয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করিলে লীলাময়ীর লীলা-রহস্য একটু একটু বুঝিতে পারিবে। 'একটু একটু' বলিলাম,—কারণ এ গুহ্য বিষয় ব্রহ্মাদিরও অগম্য। তাঁহারাও এ তত্ত্বাতীত তত্ত্বের নিগূঢ় প্রহেলিকা সম্পূর্ণরূপে ভেদ করিতে সমর্থ হন না।

জি। বাবা, তাহা হইলে আপনি স্বভাবে স্থিতিকেই জীব মাত্রের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। জীব জানিয়া বা না জানিয়া তাহাই চায়। যতদিন স্বভাবে অবস্থান করিতে না পারে, ততদিন তাহার অশান্তি ও চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে না। তবে কি ভগবৎ-প্রেম বা মুক্তি জীবের পরম পুরুষার্থ নহে?

ব। বৎস, মুক্তি না হইলে কি স্বভাবে স্থিতি হয়? স্বভাবের আবরণ বা আবরণাভাসকেই ত বন্ধন বলে। আবরণ না কাটাইতে পারিলে স্বভাবের উপলব্ধি কি প্রকারে

হইবে? আর যে প্রেমের কথা বলিতেছ, তাহাও মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় না। প্রেমাবস্থাতেই পরমানন্দের আস্বাদন হইয়া থাকে। প্রেম পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে আর স্বভাব-প্রাপ্তির বিলম্ব কি? স্বভাবের বিপর্য্যয়ই রোগ—স্বভাবের প্রতিষ্ঠাই রোগ-নিবৃত্তি বা স্বাস্থ্য। জীবমাত্রই বিকারগ্রস্ত হইয়া রুগ্নাবস্থায় প্রলাপ বকিতেছে ও যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। বিকার কাটাইয়া যখন স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে, তখন আর কোন প্রকার অশান্তি থাকিবে না। ইহাই ত সকলে চায়।

জি। বাবা, অনেকে বলেন যে, মুক্তাবস্থায় জীবের জীবভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। যদি সত্যই তাহা হয়, যদি সত্যই জীব আপন সত্তা স্থির রাখিতে না পারে, তাহা হইলে মুক্তির সার্থকতা কোথায়? যে অবস্থাতে আত্মবিলোপ হয়, তাহা কাহারও জ্ঞানতঃ প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

ব। বৎস, শুধু অসার শব্দজালে নিজেকে জড়িত করিয়া সরল বোধের পথ জটিল করিও না। সরল সত্য চিরদিনই সরল, আমরাই সহস্র আবর্জ্জনাতে তাহাকে কুটিল করিয়া ফেলি। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই শব্দমোহ কাটিয়া যাইবে—বস্তু-স্বরূপের পরিচয় আপনিই নির্ম্মল অন্তঃকরণে কিছু কিছু

ফুটিয়া উঠিবে। এ সব বিষয়ে ভালরূপে আলোচনা করিবার অবকাশ এখন নহে। এখন সংক্ষেপে দু-একটি কথা মাত্র বলিতেছি। দেখ, জীব অনিত্য নহে—জীবত্ব তাহার স্বভাবের অন্তর্গত। জীবত্ব যদি আগন্তুক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আবরণ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা নহে। ঈশ্বরও যেমন নিত্য-সত্তা, জীবও তাহাই। তাহার কি ধ্বংস আছে গো? জীব ও ঈশ্বর একই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দুইটি পৃষ্ঠ মাত্র—এককে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সে আবরণে আচ্ছন্ন হইয়াছে—জড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, ক্রিয়াশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। ইহা মায়ার খেলা। মহামায়ার কৃপায় যখন এ আবরণ কাটিয়া যায়, তখন জীব স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটা যে একটা নূতন অবস্থা তাহা নহে। আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আত্ম-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, পূর্ব্বভাবের উদয় হয়, সে অনাবৃত মুক্তপদে নিজেকে প্রকাশমান দেখিতে পায়। ইহাই জীবের ঈশ্বর-সাযুজ্য। জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ আনন্দময়—মুক্ত হইয়াই জীব এই আনন্দের উল্লাসে উল্লসিত হইয়া উঠে। মুক্তির পূর্ব্বে এই রসাস্বাদন

সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরের কখনই আবরণ নাই—তিনি সর্ব্বদাই স্বভাবস্থিত। মুক্ত জীবও এই প্রকার ঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করে। মুক্তাবস্থার এই আনন্দই ভক্তি ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অজ্ঞানী ও বদ্ধ, তাহার যেমন ঐশ্বর্য্য নাই, তেমনই প্রেমেও অধিকার নাই—মুক্তি না হইলে, স্ব-ভাব না জাগিলে, প্রকৃত আনন্দের সম্ভোগ হয় না।

জীবের জীবত্ব কখনই যায় না—মুক্ত হইলেও জীব জীবই থাকে। তবে তাহাতে ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্ম-ভাবের বিকাশ হয়, এইমাত্র বিশেষ। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া তুমি জীবের স্বরূপ-নিবৃত্তি হইল বলিয়া বর্ণনা করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার অন্তর্দ্দর্শী নয়ন থাকিলে দেখিতে পাইতে, জীবত্বের লোপ হয় নাই, কখন হইতেও পারে না। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব আছে, জীবেও তেমনি ঈশ্বরভাব আছে—যখন যে-ভাবের প্রাধান্য হয়, তখন তাহাই ক্রিয়াশীল হয় ও আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরে জীব-শক্তি আছে বলিয়াই তিনি প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছা বশতঃ জীবরূপে প্রকটিত হইতে পারেন। সেই প্রকার, জীবেও অব্যক্ত ভাবে ঐশী শক্তি আছে বলিয়া সাধনা দ্বারা মুক্তাবস্থায় তাহার বিকাশ হয়। না থাকিলে এরূপ কদাচ হইতে

পারিত না। কারণ, যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহার স্ফূর্ত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না। জীব ও ঈশ্বর-শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জড়শক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। যাহাকে তোমরা জড় বলিয়া বর্ণনা কর, তাহাতেও জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব, অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ, উভয়ই আছে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হইলে তাহারই প্রভাবে জড় বস্তুর সর্ব্বত্রই চৈতন্য দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। অচেতন শুষ্ক জড় পদার্থ বলিয়া জগতে কিছুই নাই, ইহা তখন বুঝিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলে। জ্ঞানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে জড় বস্তুর সত্তাই অব্যক্ত হইয়া যায়, এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিরাজমান থাকে।

এই প্রকার ভক্তি-সাধনার উৎকর্ষে সর্ব্বত্র আনন্দের আস্বাদন হয়। ইহাই ঈশ্বরোপলব্ধি। আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, দূরে নিকটে, মিত্রে ও শত্রুতে, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই একমাত্র আনন্দময় ঈশ্বর-সত্তা অনুভূত হয়,—যে দিকে লক্ষ্য করা যায় সেই দিকে তাহাকেই সম্ভোগ করা যায়, এক অনন্ত অক্ষয় আনন্দ-প্রবাহ ব্যতীত কোথাও আর কিছু বোধগম্য হয় না,—ভিতরে, বাহিরে, নিন্দাতে স্তুতিতে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বদেশে নিয়ত মধুক্ষরণ হইতে থাকে। প্রহ্লাদ

স্ফটিক-স্তম্ভেও হরিকে দেখিতে পাইয়াছিল—সবই তার মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার নিকটে ক্রিয়াশীল জড়শক্তিও হ্লাদিনী শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল—বিষ অমৃতে পরিণত হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে জীবেও অব্যক্তভাবে জড় শক্তি নিহিত আছে—তাহার প্রাধান্যবশতঃ জীব বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর-সত্তাতেও অব্যক্তভাবে জড় শক্তি আছে। মোট কথা, সব ভাবেই সব ভাব জড়িত আছে। যখন যেটা প্রধান হয় তখন সেটাই কার্য্য করে—অন্যান্য ভাব তাহার অনুসরণ করে মাত্র।

জীব বল, শিব বল, জড় বল—সবই এক মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ—"একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" সবই সত্য, অথচ মূলে কিন্তু এ-সব কিছুই নাই—সাম্য কালে সব একাকার হইয়া এক সত্তাতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু কিছুরই বিনাশ নাই। সুতরাং জীব যখন শিবত্ব বা ঈশ্বরত্ব লাভ করে, তখনও তাহার জীবত্ব ঘোচে না।

দেখ, কোরক হইতে ফুটন্ত ফুলের বিকাশ হয়, কিন্তু ফুলে আর কোরকের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেটা তোমাদের স্থূল দৃষ্টির কথা। আমি এই মুহূর্ত্তে ফুটন্ত ফুলটিকে আবার ঠিক পূর্ব্ববৎ

কোরকে পরিণত করিয়া দেখাইতে পারি। প্রসঙ্গতঃ তোমাদিগকে বহু বার বহু প্রকারে তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহার তত্ত্ব-চিন্তা করিয়াছ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, কোরকে যেমন পুষ্পভাব বর্ত্তমান আছে, তেমনই প্রস্ফুটিত পুষ্পেও কোরকত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ফুল ফুটিয়াছে বলিয়াই যে কোরকত্বের ধ্বংস হইয়াছে, তাহা নহে—তুমি যেমন কোরকে পুষ্প দেখিতে পাও না, তেমনই পুষ্পেও কোরক দেখিতে পাও না—তোমার দেখা ও না দেখার কোনই মূল্য নাই। ঘৃত হইতে দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত বাহির করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। জগতের যাবতীয় পদার্থ মিশ্র বলিয়া যে-কোন বস্তু হইতে তোমার ইচ্ছানুসারে আমি যে-কোন বস্তু বাহির করিয়া দেখাইতে পারি। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কিছুরই আত্যন্তিক অভাব হয় না। সুতরাং যখন মুক্তিতে ঈশ্বর-ভাবের বিকাশ হয়, তখনও জীবত্বের লোপ হয় না—তবে ঐশ্বরিক শক্তির প্রাধান্যে জীবশক্তির বিশেষ ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা অবশ্য সত্য।

জি। সমুদ্রে যখন শত শত নদ-নদী মিলিত হয়, তখন কি তাহাদের পার্থক্য থাকে? তখন কি সেই সকল নদী আপন আপন নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে না?

ব। পার্থক্য চিরকালই থাকে, যদি দেখিবার বা অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহা ধরাও যায়। সমুদ্র হইতে আমি গঙ্গাজল ও সিন্ধুনদের জল পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারি। তুমি দশ হাজার মণ জলে এক ছটাক দুধ ঢালিয়া দিলে তাহা আর দেখিতে পাও না—মনে কর, দুধ জলে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা তোমার ভ্রান্তি, দুধ নিজের সত্তা কখনই হারায় না—তবে জলের পরিমাণ অধিক বলিয়া দুধ চিনিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞানী ও যোগী, সে তাহা পারে।

জি। ইহা হইতে মনে হয়, ঈশ্বরের সত্তাতে মগ্ন হইলেও জীবের স্বকীয় সত্তা লুপ্ত হয় না। এখন প্রশ্ন এই —এই মগ্ন জীবকে কি পুনরুদ্ধার করা যায়?

ব। মগ্ন হইলেও জীবের সত্তা যে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরুদ্ধারও যে না হইতে পারে, তাহা নহে। তবে যে ঈশ্বর-তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া মহাশক্তিতে প্রবিষ্ট হয়, অন্যের পক্ষে তাহাকে বাহির করিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ, যে সেই রূপ চেষ্টা করিতে যাইবে তাহার সেই প্রবলাবর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজেরই বোধ হারাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া জীবের সত্তা-লোপ হয়, এমন নহে।

জি। শাস্ত্রে আছে, প্রকৃতি-লয় হইলে পুনরুত্থান হয়, কিন্তু কৈবল্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে আর উত্থান হয় না। বেদান্তেও "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্রে মুক্ত পুরুষের পুনরুত্থান অস্বীকৃত হইয়াছে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। অর্থাৎ যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না তাহাই ভগবানের স্ব-ধাম। জৈনগণ বলেন, সিদ্ধশিলা অতিক্রম করিয়া অলোকাকাশে প্রবিষ্ট হইলে আর প্রপঞ্চে আকৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধগণ বলেন, অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের পরে ব্যুত্থান হয় বটে, কিন্তু যাহার প্রতিসংখ্যা-নিরোধ হইয়াছে, তাহাকে আর ফিরিতে হয় না। অন্যান্য দেশের জ্ঞানিগণও প্রকারান্তরে এই কথা বলিয়াছেন। সকলের মতেই এমন একটি অবস্থা আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়। আপনি কি তাহা স্বীকার করেন না? তবে কি আপনার মতে নির্ব্বাণ বলিয়া কোন পদার্থ নাই?

ব। স্বীকার করি বই কি। তবে তোমরা যে-ভাবে কর, আমি সে-ভাবে করি না। জীব নিজের সত্তা না হারাইলেও সত্তা-বোধ হারাইতে পারে। বোধ না থাকিলে সত্তা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই।

অপ্রকাশমান সত্তাকে অসৎ বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না। এই স্ব-সত্তা-বোধের লোপাবস্থাই নির্ব্বাণ। অবশ্য, দুর্ব্বল জীব অকস্মাৎ প্রবল শক্তির সম্মুখীন হইলে অভিভূত হইয়া পড়ে, অজ্ঞান হয়। যাহার প্রভাবে সে এই প্রকারে জ্ঞান হারায়, তাহার মাত্রা অনুসারে জীবের ব্যুত্থান-সম্ভাবনা নিয়মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণ জীব যে স্তরেতে অভিভূত হয়, তদপেক্ষা অধিক শক্তি যাঁহার আয়ত্ত আছে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ স্তর হইতে জীবকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন। ঈশ্বরাবস্থা পর্য্যন্ত জীবের ব্যুত্থান-সম্ভাবনা আছে, কারণ যোগী স্ব-সত্তা-বোধ সংরক্ষণ করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারেন। কাজেই, ইচ্ছা থাকিলে এই অবস্থা হইতেও জীবের বহিরাগমন সম্ভবপর।

কিন্তু ইহার পরে যে অবস্থা, তাহার আদি-অন্ত নাই। সেই অকূল পারাবার হইতে পুনরাবর্ত্তন অসম্ভব। সেখানে ইচ্ছা নাই, জ্ঞান নাই, ভাব ও অভাব কিছুই নাই—সেখানে ভেদও নাই, অভেদও নাই, এক অনন্ত অপার ও অতল জলরাশি আপন স্তিমিত গাম্ভীর্য্যে আপনি নিমগ্ন, আবার আপনার সহিত আপনিই ক্রীড়া-পরায়ণ। সেইখানে ভোক্তা ভোগ্য ভোগ কিম্বা জ্ঞাতা জ্ঞেয়

জ্ঞান কিছুই নাই। এক অনন্ত প্রকাশ বা অপ্রকাশ অনাদিকাল হইতে যেন নিরন্তর আপনাকেই আপনি দেখিতেছে, অথবা যেন দেখা-অদেখার অতীত কি-এক অব্যক্ত অচিন্ত্য পরম ভাবে অথচ ভাবাতীত স্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহাই মহাশক্তির চরণচ্ছায়া। জীব এই অকূল পাথারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকে না, অন্যের পক্ষেও তাহাকে বাহির করিবার আশা নাই। কারণ, কেহ আপন পৃথক্ সত্তাবোধ রক্ষা করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাহাকে তোমরা ঈশ্বর বল, তিনি এই অনন্ত-স্বরূপা মহা-জননীর অঙ্কস্থিত শিশুমাত্র—ইঁহারই কণামাত্র শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া তিনি নিত্য-যোগীর আদর্শভূতরূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পাদন করিয়াও নিষ্ক্রিয় ধ্রুবাবস্থাতে বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বরেরও এমন সামর্থ্য নাই যে, তিনি মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার বাহির হইয়া আসেন। তবে মায়ের ইচ্ছা হইলে সকলই সম্ভব-পর। আমার মনে হয়, শাস্ত্রের ভাষায় ইহাকেই নির্ব্বাণ বলে। ইহা যে প্রার্থনা করে করুক, কিন্তু যোগীর ইহা প্রার্থনীয় নহে। যোগী জ্ঞান হারাইয়া অভিভূত হইতে চায় না, তাই সে নির্ব্বাণের প্রার্থী

নহে। সে মায়ের কোলে উঠিয়া মায়ের সকল খেলা দেখিতে চায়, এবং মায়ের কৃপায় খেলা দেখাইবার অধিকারও লাভ করে।

জি। কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর? সেই বিরাট্ সত্তার সংসর্গ-লাভ করিয়াও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা কি প্রকারে হইতে পারে? প্রবলের সংঘর্ষে দুর্ব্বল চিরদিনই অভিভূত হইয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই সেই পরম বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হয়, তবে কি আর জীব নিজের পার্থক্য-বোধ রাখিতে পারে?

ব। হাঁ, তা পারে বৈ কি? প্রবলের সংসর্গে অভিভূত হওয়ার ভয় আছে বলিয়াই ত সবল হওয়ার ব্যবস্থা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। এই বল বা শক্তি সঞ্চয়ই ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনার উদ্দেশ্য। শক্তির আরাধনা ভিন্ন শক্তি-লাভ হয় না—শক্তি ব্যতিরেকে স্ব-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না। তোমরা একটু সামান্য তেজেই অভিভূত হইয়া পড়—সেই প্রবল তেজের সাহচর্য্য কি প্রকারে সহ্য করিবে? প্রথমে তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হও—তবে তাঁহার কোলে উঠিলে আর অভিভূত হইবে না। লৌহখণ্ড যেমন অগ্নির আবেশে অগ্নিময় হইয়া যায়, অথচ অগ্নিময় হইয়াও লৌহই থাকে, তদ্রূপ সেই মহাশক্তির আরাধনা দ্বারা নিজেকে শক্তিময়,

তেজোময়, সম্পন্ন কর—পরে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জাগ্রৎ থাকিতে পারিবে, অনন্তের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। যদি সত্য সত্যই মায়ের সন্তান হইতে পার, তবে আর মায়ের কোলে উঠিতে ভয় কিসের? ভগবানের কৃপাবলে বলী হইয়াই ভক্ত ভগবান্‌কেও পরাজয় করে—এ কথা ত বহুবার পুরাণে পাঠ করিয়াছ। জানিও, ইহা খাঁটি সত্য। তাঁহারই অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বাঁধিতে হইবে—অন্য কোন অস্ত্র সেখানে কার্য্য করিবে না।

জি। তাহা হইলে নির্ব্বাণের পথে না যাইয়া মায়ের কোলে শিশুর মতন চিরদিনই তাঁহার সহিত যোগ-যুক্ত হইয়া থাকা যায়। সত্যই ত, যে মাতৃস্নেহের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহার আর ভয় কি? কিন্তু একটি কথা। আপনি সেই পরম ভাবকে মাতৃভাবে বর্ণনা করেন কেন?

ব। তবে আর কোন্ ভাবে করিব? যিনি সকল ভাবেরই স্বরূপভূত হইয়াও সকল ভাবের অতীত, তাঁহার কি বর্ণনা হয় গো? তিনি একাধারে মা ও বাবা—দুই-ই। কিন্তু শিশুর পক্ষে মায়ের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্ত্তী আর কে আছে? তাই মাকেই সে চিনে, মাকেই সে ডাকে—মায়েরই প্রতাপে সে

বাবাকে চিনিতে পারে। তখন ক্রমশঃ সকল ভাবের সহিতই তাহার পরিচয় হয়। বৎস, প্রথমে শিশু হও, মনটিকে শিশুর মতন সরল ও নির্ম্মল কর, সংসারের কূট তর্কজালরূপ জটিলতা পরিত্যাগ কর, অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার কর, বাহিরের সকল আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া একবার অন্তরের অন্তরতম স্থলে একাকী প্রবেশ কর ও কাতর প্রাণে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে থাক—দেখিবে, সন্তানের ব্যাকুল আহ্বানে বিশ্বজননী আবির্ভূত হন কি না। মায়ের মতন এমন স্নেহ কাহার? যদি প্রকৃত ভালবাসা কোথাও থাকে, ত মায়ের প্রাণেই তাহা আছে। তাই মাকে জাগাও, জাগাইয়া মায়ের কোলে উঠিয়া বস,—সকল অভাব মিটিয়া যাইবে, সকল আশঙ্কা দূর হইবে। শিশুর পক্ষে মাতৃ-অঙ্কই ত প্রকৃত স্থান। সেখানে বসিয়া যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। যখন যে ভাবের উদয় হইবে, তখনই সেই ভাবের বিকাশ হইবে—ইচ্ছার উন্মেষ হওয়ামাত্রই পূর্ণতা হইবে। সেই মহাভাব-স্বরূপিণীকে প্রাপ্ত হইলে কোন ভাবই আর অপ্রাপ্ত থাকিবে না। পরে আর ইচ্ছারও উদয় হইবে না, সকল ভাব ঘুচিয়া গিয়া ভাবাতীত অবস্থায় স্থিতিলাভ করিবে। মহাভাবই মা, আর ভাবাতীতই বাবা।—একটি

শক্তিস্বরূপ, অপরটি শিবস্বরূপ—অথচ উভয়ে কোন ভেদ নাই। মাতা ও পিতা যখন অভিন্ন হইয়া যান, তখন সন্তানেরও পৃথক্ সত্তা থাকে না। তখন শক্তি, শিব ও জীব—তিন একাকার হইয়া যায়। আবার মায়ের কৃপায় জীবের সত্তা-বোধ ফুটিয়া উঠে—রস-বোধ ফিরিয়া আসে। ইহাই মায়ের খেলা—এই সঙ্কোচ ও বিকাশরূপেই মাতৃ-লীলার স্ফুরণ হয়। নির্ব্বাণের পথে এই লীলা-রসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। নির্ব্বাণে ব্যক্তিত্ব থাকে না—উহা বিরাট্ সত্তায় অভিভূত হইয়া যায়।

জি। জগদম্বার কৃপায় জীবভাব অক্ষত রাখিয়াও পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর—সুতরাং জীবত্ব যে আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, তাহার যে উচ্ছেদ হয় না, তাহা সত্য কথা।

ব। বৎস, ভাষার বাগুরায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিও না। সাধারণতঃ লোকের জীবভাবের জ্ঞানই নাই—একটা কথা মাত্র শুনিয়া রাখিয়াছে, তাহারই প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন ভাবেরই নাশ নাই, উদ্ভবও নাই—একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে জীব যদি স্ব-ভাবের বোধ রক্ষা করিতে না জানে ও না পারে, তাহা হইলে তাহার অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। সে অবস্থায় আনন্দ বা

শান্তি—কিছুরই বোধ থাকে না। কিন্তু সেখানেও জীবভাব নষ্ট হয় না। যে সে দশায় উপনীত হয়, তাহার পক্ষে অবশ্য জীবভাব থাকিয়াও না থাকার সমান—কারণ উহার জ্ঞান বা ক্রিয়া কিছুই হয় না। কিন্তু যোগিগণ এই অবস্থা চান না। তাঁহারা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে—স্বয়ং-প্রকাশরূপে—মায়ের কোলে সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিতে চান এবং থাকিতে পারেন।

জি। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা ত ভক্তগণেরও প্রাণের কথা।

ব। যোগী ভিন্ন আবার ভক্ত কে? যোগীই কর্ম্মী, যোগীই জ্ঞানী, যোগীই ভক্ত ও প্রেমিক—আবার যোগীই সর্ব্বভাবের অতীত। যোগের পরিপক্ক অবস্থাকেই ভক্তি বলে—ভক্তিতেই যোগের চরম উৎকর্ষ।

জি। তবে কি "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার বোধ ভ্রান্তি মাত্র।

ব। ভ্রান্তি বলিতে পার, না বলিতেও পার। ব্যাবহারিক ভাষায় সে অবস্থার বোধ প্রকাশিত হয় না। অগ্নিময় লৌহখণ্ড যদি নিজেকে অগ্নি বলিয়া বোধ করে ও বলে "আমি অগ্নি", তবে তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। কারণ, দহন করিবার সামর্থ্য ও অন্যান্য অগ্নিধর্ম্ম তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ উহা

মিথ্যাও বটে—কারণ অগ্নিসম্বন্ধচ্যুত হইলে তাহার অগ্নিময়তা থাকে না। তখন সে যে লৌহ, সেই লৌহই থাকিয়া যায়। সুতরাং লৌহ যখন অগ্নিময় হয় তখনও সে বাস্তবিক অগ্নি হয় না। তবে যদি অগ্নির সহিত লৌহের যোগ নিত্য অচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে লৌহের পক্ষে লৌহত্ব সত্ত্বেও 'আমি অগ্নি' এই প্রকার অনুভব সম্ভবপর। সেই প্রকার, যিনি যোগী, যাঁহার যোগ বা সম্বন্ধ কখনও ছিন্ন হয় না, যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে সদাযুক্ত, তিনি ব্রহ্ম না হইলেও নিয়ত-সম্বন্ধ-বশতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম সকল তাঁহাতে অভিব্যক্ত হয় বলিয়া নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব বা বর্ণনা করিলে দোষের হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার স্ব-সত্তা নাই তাহা নহে—তাঁহার স্ব-সত্তা ও তদ্বোধ হারায় না। 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভূতিটিকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে, ইহাতেও দুইটি জিনিষ ও তাহার সম্বন্ধ আছে। এই 'আমি'টিই ত বিশুদ্ধ জীবরূপ আত্মা—তাহার বোধ যদি না থাকে তাহা হইলে 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব হইতেই পারে না। শুদ্ধ ব্রহ্ম-সত্তাতে আমিত্ব নাই —আত্মভাবকে আশ্রয় না করিয়া আমিত্বের অনুভব জাগে না। যখন স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আধারে আমিত্বের স্ফুরণ হয় তখন বন্ধন, আর যখন এই সকল

আধার ব্যতিরেকেও তাহার স্ফুরণ হয় তখন মুক্তি। মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মবোধ থাকে—উহা ব্রহ্মাশ্রয়ে প্রকাশমান হয়। সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভব একেবারে মিথ্যাও নহে। ইহাই পরমানন্দরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা যোগাবস্থা—এ অবস্থায় আমি-বোধ বা আত্মবোধ লুপ্ত না হইয়া ব্যাপকতা লাভ করে। ব্রহ্ম যেমন ব্যাপক, ব্রহ্মের সহিত যোগপ্রাপ্ত 'আমি'ও তেমনই ব্যাপক হইয়া পড়ে। অথচ আমিত্বের লোপ না হওয়ার দরুণ বোধ লুপ্ত হয় না। এই অবস্থাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মভাব বলা যায় না, কারণ ব্রহ্মে অহম্ভাব নাই; অথচ জড় প্রকৃতির আবরণে আচ্ছন্ন জীবভাবও বলা চলে না, কারণ এই অবস্থায় কোন প্রকার আবরণ থাকে না। ইহা ব্রহ্ম ও আত্মার মিলনাবস্থা। এই মিলনই যোগ—ইহাতেই আনন্দ। যোগী এই মিলনেরই প্রার্থী। তিনি একেবারে বোধহীনরূপে মিশিয়া যাইতে চাহেন না। তিনি চাহেন নিজবোধাত্মক, চিদ্ঘন ও পরমানন্দময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে। বোধকে স্থায়ী করিতে পারিলে ইহাই নিত্য আনন্দ —বোধের অতীত হইলে ইহাই অদ্বৈত-স্থিতিরূপ নির্ব্বাণ বা নির্ব্বাণের আভাস। নির্ব্বাণে 'আমি' থাকে না বলিয়া কোন বোধই থাকে না—যাহা

থাকে তাহাকে বোধ বলিতে যাওয়া শব্দের অপব্যবহার মাত্র। যেখানে বোধই নাই সে অবস্থাকে আনন্দময় বলা কিছুতেই চলে না। সেটা আনন্দ ও নিরানন্দের অতীত অবস্থা হইতে পারে, কিন্তু আনন্দ নহে। যাঁহারা নির্ব্বাণকে পরমানন্দময় বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাদের বর্ণিত নির্ব্বাণ পূর্ব্বোক্ত যোগাবস্থারই অন্তর্গত। কারণ দুইটি বস্তুর সংযোগ ভিন্ন আনন্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে না।

জি। হাঁ বাবা, যে সকল বৌদ্ধ-সম্প্রদায় "নির্ব্বাণং পরমং সুখং ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্" বলিয়া নির্ব্বাণের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাও স্পষ্টাক্ষরে উহাকে 'মহাসুখ' বলিয়াই বর্ণনা করেন এবং উহা যে দুইটি বস্তুর পরস্পর সংযোগ হইতে প্রকাশমান হয়, তাহাও বলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পরমানন্দময় যোগই নির্ব্বাণপদবাচ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণবাদি ভক্ত সম্প্রদায় ঐ অবস্থাকেই দাস্য বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহা আমার বিশ্বাস। আত্মা যখন ব্রহ্ম-সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াও ব্রহ্মাশ্রিত ভাবে প্রকাশ পায় তখন উহা দাস ভিন্ন আর কি? মুক্ত হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে দাস্যজ্ঞান বা নিজেকে আশ্রিত বলিয়া বোধ হয়—'এক অনন্ত মহাশক্তির বক্ষে তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া জাগিয়া আছি,' এই

বোধ ফুটিয়া উঠে। যে মায়াতীত যোগী, তাঁহারই ভাগ্যে এই বোধ জাগে—সকলে এ আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ, এই দাস্যই প্রভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য—কারণ তখন আত্মা আপ্তকাম হইয়া আপন মহিমায় বিরাজ করে। ব্রহ্মসাধর্ম্ম্যই ঐশ্বর্য্য —জীব তখন জীব থাকিয়াও ঈশ্বর-ভাবাপন্ন। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তখন অপ্রতিহত। যে সকল শৈব-সম্প্রদায় ঐশ্বর্য্যকেই পরমার্থরূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারাও বস্তুতঃ এই যোগাবস্থারই প্রার্থী।

ব। এই যোগাবস্থাই সকলের প্রার্থনীয়। যিনি যাহাই মুখে বলুন, বাস্তবিক পক্ষে ইহাই তাঁহার কাম্য—নির্ব্বাণ কাহারও প্রার্থনীয় নহে। তবে কেহ জানিয়া চান, কেহ না জানিয়া চান। যিনি জানিয়া চান, তিনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে কালক্রমে সফল হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানমূলক নহে, তিনি অনুরূপ উপায় গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হন, ইহাই প্রভেদ।

তবে বোধের অতীত অবস্থাও আছে—এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা কাহারও পুরুষার্থ নহে। একবার উপাদান নির্ম্মাণ হইয়া গেলে, সত্ত্বশুদ্ধি ও মুক্তি হইলে, ঐ অবস্থায় যাইবার

জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। জোয়ার-ভাঁটার ন্যায় একবার বোধ জাগিয়া উঠে, আবার ক্ষণেকের জন্য হারাইয়া যায়, আবার জাগিয়া উঠে—এইরূপ চলিতে থাকে। ইহাই মহামায়ার নিত্যলীলা—সন্তানের সহিত চিরন্তন খেলা। কিন্তু ইহা ঠিক ব্যুত্থান ও নিরোধ নহে—কারণ, ব্যুত্থান ও নিরোধ চিত্তের হয়, ইহা চিত্তের ব্যাপার নহে।

জি। যোগীও যখন বোধাবোধের অতীত অবস্থায় যান, তখন নির্ব্বাণ যে যোগেরও চরম ফল তাহা বলিলে দোষ কি ?

ব। না, ঐ অবস্থাকে ঠিক নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাণের পরে আর বোধ ফিরে না। নির্ব্বাণ হয় বলহীনের—যাহার স্বত্ব জন্মায় নাই, সেই প্রবল শক্তির প্রভাবে আপন বোধ হারাইয়া অনন্তের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিশিয়া যায়। যিনি যোগী—তাঁহার নির্ব্বাণ হয় না। তিনি মহাশক্তির উপাদানে নিজেকে গঠিত করিয়াছেন বলিয়া কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষার্থের সাধন।

জিজ্ঞাসু। এই যে পরমানন্দময় যুক্তাবস্থার কথা বলিলেন, ইহা কি সংসারের সকলেই পাইতে পারে ?

বক্তা। হ্যাঁ, চেষ্টা করিলে সকলেই এই অবস্থা পাইতে পারে। সকলেই স্থূলতত্ত্বের ঘনীভূত আচ্ছাদনে অন্ধীভূত হইয়া জড়ভাবের মধ্যে বিচরণ করিতেছে বলিয়া পরম সাম্যময় জগতের আদিস্বরূপ সে চিন্ময় তত্ত্বকে অন্বেষণ করে না। যিনি সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা শিব-স্বরূপা ও সর্ব্বার্থসাধিকা, যিনি শরণাগত দীন ও আর্ত্তের পরিত্রাণপরায়ণা, যিনি অপার বাৎসল্যশালিনী চির-স্নেহময়ী বিশ্বজননী, যাঁহাকে পাইলে জীবের যাবতীয় অভাব চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়, জীব তাঁহাকেও ভুলিয়া গিয়াছে—ভুলিয়া ক্ষুদ্র সুখের আয়োজনে বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদ্রে যাহার বাসস্থান, সে আজ এক বিন্দু জলের জন্য তৃষ্ণা-কাতর হইয়া মরুভূমির তপ্ত বালুকার উপরে মরীচিকার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মায়ার প্রভাবে জীব নিজেকে ও নিজের জন্মদায়িনীকে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সৎপথে

অগ্রসর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে—তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। কিন্তু ভ্রান্তির আবরণে সকলেই সুখ-সুপ্তভাবে চিত্র-বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। জাগিয়া দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিবার পরিশ্রম কেহই স্বীকার করিতে চায় না। কিন্তু পরিশ্রম করিলে ফল-লাভ অবশ্যম্ভাবী। চেষ্টা করিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

এই চেষ্টাই সাধনা বা পুরুষকার। ইহাকে অবলম্বন না করিয়া শুধু দৈবের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ।

জি। বাবা, আপনার কথা হইতে মনে হয় যে, সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়, চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। কিন্তু এক দিকে প্রাক্তন-কর্ম্মরূপ পূর্ব্ব সংস্কার এবং অপরদিকে ভগবানের কৃপা বা অনুগ্রহ না পাইলে শুধু চেষ্টা করিয়া গেলেই কি ফললাভ ঘটে ?

ব। বৎস, প্রাক্তন কর্ম্ম কাহার কিরূপ আছে, তাহা ত তোমাদের জানা নাই। সুতরাং প্রাক্তন কর্ম্মের নাম করিয়া শিথিল-প্রযত্ন থাকা সদ্‌বিবেচনার চিহ্ন নহে। "আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম ভাল নহে—সুতরাং চেষ্টা করিয়া কি লাভ," এই প্রকার মানসিক ভাব দূষণীয়। তদ্রূপ পূর্ব্বকর্ম্মের সাধুত্ব ও প্রবলতা কল্পনা

করিয়া চেষ্টার অনাবশ্যকতা মনে করাও দূষণীয়। পূর্ব্ব কর্ম্ম ভালই থাকুক, আর মন্দই থাকুক, অল্পই থাকুক আর অধিকই থাকুক—তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তোমার জ্ঞানের অগোচর, তাহা লইয়া বৃথা চিন্তায় ফল কি? বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নবীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কৃতকর্ম্ম কখনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যদি সরল প্রাণে ঠিক পথে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহারই আকর্ষণে সঞ্চিতকর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে অনুরূপ কর্ম্মসংস্কার আপনিই আসিয়া যোগদান করে। তাহাকে আহ্বান করিতে হয় না। অল্প পরিশ্রম করিয়া যে কাহাকেও আপাততঃ অধিক ফল পাইতে দেখ, ইহাই তাহার কারণ। বস্তুতঃ যাহার যে প্রকার কর্ম্ম, তাহার ফললাভও সেই প্রকার। বর্ত্তমান সময়ের চেষ্টা অল্প হইলেও পূর্ব্বকৃত সদৃশ কর্ম্মের সংস্কার তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রবল করিয়া তুলে। যে সম্পূর্ণভাবে অলস থাকে, সে নিজের প্রাক্তন কর্ম্মের ফললাভ হইতেও বঞ্চিত হয়। পূর্ব্ব সংস্কার যদি প্রতিকূল থাকে তাহা হইলেও চেষ্টার নিষ্ফলতা সিদ্ধ হয় না। কারণ চেষ্টা যদি সংস্কারানুরূপ প্রবল হয়, তাহা হইলে উহার প্রভাবে সংস্কার কাটিয়া যায়। আর যদি উহা সংস্কারাপেক্ষা দুর্ব্বল হয়, তবে চেষ্টার

বলাবলের অনুপাতে সংস্কার নষ্ট হয়। সুতরাং কোন স্থলেই সাধু চেষ্টা বিফল হইবার নহে। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—শুভকর্ম্ম অল্প হইলেও কল্যাণ প্রসব করিয়া থাকে। তবে যদি চেষ্টা অত্যন্ত তীব্র হয়, তাহা হইলে সংস্কার-ধ্বংস হইবার পরেও তাহার ফল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মোট কথা, পুরুষকার অবলম্বন করিতেই হইবে—নতুবা কৃত-কর্ম্মেরও ফললাভ হইবে না। ভগবৎ-কৃপার কথা যে বলিতেছ, তাহাও চেষ্টাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপা অহেতুক, নিত্য, সর্ব্বব্যাপক—তাহা ত সর্ব্বদা ও সর্ব্ব অবস্থাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে কাহারও কোন প্রকার ইষ্টসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য সর্ব্বদাই আলোক বর্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু যে অন্ধ, সে ত ঐ আলোকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং আলোক থাকিলেও তাহার ক্রিয়ার অনুভূতি পাইতে হইলে নিজের চক্ষু খুলিতে হয়—নতুবা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই সমান। সেই প্রকার ভগবান্ স্বভাবতঃই কৃপাশালী, তাঁহার কৃপা চাহিয়া লইতে হয় না, ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু তাহা গ্রহণের অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়। কর্ম্ম করিলে তাঁহার কৃপার অনুভূতি পাইতে বিলম্ব হয় না। বৎস,

পুরুষকার ও কৃপা পরস্পর-সাপেক্ষ। এক পাখীর দুইটি ডানার ন্যায় প্রত্যেকটি আপন সার্থকতার জন্য অন্যটির উপর নির্ভর করে। পুরুষকারহীনের পক্ষে কৃপার প্রত্যাশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। ইহা আলস্যের প্রশ্রয় মাত্র। আর কৃপা ভিন্ন পুরুষকারও ফল প্রসব করিতে পারে না।

জি। পুরুষকার বা সাধনা ও কৃপা পরস্পর সাপেক্ষ হইলে পুরুষকার না করিয়া কৃপার প্রত্যাশায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে দোষ কি? আপনি কৃপার কথা না বলিয়া সাধনা অথবা কর্ম্মের উপর এতটা জোর দেন কেন? চাতক যেমন মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করিতে যায় না, মানুষও যদি সেই প্রকার সকল সাধনা ত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা কি দোষাবহ?

ব। বৎস, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অতি উচ্চাবস্থার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ অবস্থা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। দীর্ঘকাল সংযম, শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কঠোর সাধনা করিলে কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রকৃত নির্ভরের অবস্থায় সত্যই উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু গোড়া হইতেই সাধনা পরিত্যাগ করিলে ঐ

অবস্থা কখনও আবির্ভূত হইতে পারে না। প্রথমে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার বিকাশ কি প্রকারে হইতে পারে? তোমরা ত গীতা পড়িয়াছ। সমস্ত গীতাতে কর্ম্মের উপদেশ রহিয়াছে—শুধু অষ্টাদশ অধ্যায়ের অবসানে কর্ম্মত্যাগ ও শরণাপন্ন হওয়ার কথা বর্ণিত দেখা যায়।

জি। কর্ম্ম বা সাধনার প্রাধান্য প্রথমাবস্থায় স্বীকার করিবার হেতু কি?

ব। মানুষ যতদিন স্থূল দেহে অভিনিবিষ্ট থাকে, ততদিন তাহার কর্ত্তৃত্ব-অভিমান বা অহঙ্কার বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় তাহার কর্ম্মেই অধিকার। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লও। স্থূলদেহে আবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্ম্ম না করিয়া নিস্তার নাই। 'কর্ম্ম করিব না' বলিয়া বসিয়া থাকিতে গেলেও তাহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে। কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন এমন কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া যায়। এই কৌশল-যুক্ত কর্ম্মকেই যোগ বলে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ যোগ আশ্রয় করিতেই হইবে।

দেখ, কৃপা যেমন ঈশ্বরের ধর্ম্ম, পুরুষকার তেমনি পুরুষের অর্থাৎ জীবের ধর্ম্ম। জীব ভিন্ন ঈশ্বর অথবা

ঈশ্বর ভিন্ন জীবের সত্তা কাল্পনিক। সুতরাং পুরুষকার এবং কৃপাও পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। তবে স্থূল-ভাবাপন্ন জীবের পক্ষে কর্ম্মই প্রথম সোপান। দেহাত্মবোধ হইতে অহঙ্কার হয় এবং অহঙ্কার হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি হয়। যেখানে কর্ত্তা নাই সেখানে কর্ম্মও নাই, কর্ম্মের ফলভোগ অর্থাৎ সুখ-দুঃখও নাই। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়ই স্থূলসম্বন্ধমূলক। সেই সম্বন্ধ কাটিয়া গেলে কর্ম্ম ও ভোগ উভয়ই তিরোহিত হয়। জীবাত্মা হইতে স্থূল-দেহের অভিনিবেশ কাটিয়া গেলে উহা নিষ্ক্রিয় ও সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া চির-শান্তির আলয় হয়। এই স্থূল-ভাবকে অতিক্রম করাই জীবের প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম সাধনা। কিন্তু স্থূল হইয়া স্থূলকে লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করা, আর আপন ছায়া লঙ্ঘনের চেষ্টা করা—দুই-ই নিষ্ফল। কাজেই, স্থূলদেহে অবস্থান কালে কর্ম্মত্যাগ একেবারে অসম্ভব। যে পথেই চল, তাহাই কর্ম্ম। সব কর্ম্ম হইতে স্থূল ভাবের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া কৌশলযুক্ত কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। ইহারই নামান্তর যোগ।

জি। আপনি ত কর্ম্মেরই প্রশংসাবাদ করিতেছেন। তবে কি কৃপার আবশ্যকতা নাই?

ব। আছে বই কি? কিন্তু কৃপার জন্য চিন্তা করিয়া

বসিয়া থাকিতে হয় না। কর্ম্মের আশ্রয় করিলে যথাসময়ে কৃপার বিকাশ হইবেই। অগ্নি যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সেই নিষ্ক্রিয় অগ্নি দ্বারা দাহ বা প্রকাশরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কিন্তু কার্য্যের সাধন করিতে হইলে অগ্নিকে জাগাইয়া লইতে হয়, সেইপ্রকার কৃপা সম্বন্ধেও জানিবে। কাষ্ঠে অগ্নি আছে কিন্তু সে আগুনে কাঠ পোড়ে না, কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া ঐ সুপ্ত অগ্নিকে চেতন করিতে পারিলে তবে তাহা দ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করা যায়। অব্যক্ত অথবা নিষ্ক্রিয় অগ্নি দাহ প্রভৃতি ক্রিয়া করিতে পারে না বলিয়া থাকিয়াও না থাকার সমান। তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া অন্নরূপে পরিণত করা অগ্নির কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তদ্রূপ, জীবের উর্দ্ধ-গতিও কৃপা ভিন্ন হয় না। ভগবান্ যে জীবকে নিরন্তর নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার কৃপা। এই স্বাভাবিক আকর্ষণ-শক্তির সাহায্য না পাইলে বদ্ধ জীবের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, তাহা দ্বারা সে তাঁহার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু অগ্নিকে কার্য্যক্ষমরূপে পাইতে হইলে যেমন কাঠে কাঠে ঘর্ষণ না করিলে চলে না, তদ্রূপ

কৃপার প্রভাব অনুভব করিতে হইলে কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। ভগবৎ-কৃপা নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপক হইলেও জীব দেহাধ্যাসবশতঃ স্থূল আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া অভিমান-গ্রস্ত থাকিবার দরুণ উহা অনুভব করিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে জীব অনায়াসে ভগবৎ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চিরদিনের জন্য জগতের শোক-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় না, হইবার উপায় নাই। ভগবানের কৃপা সত্য, একমাত্র ঐ কৃপার অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে জীবের উদ্ধার সম্ভবপর নয়, তাহাও সত্য, কিন্তু অহঙ্কারশীল জীবের পক্ষে কৃপা সত্য হইলেও নিষ্ফল। স্থূলের আবরণ যে পরিমাণে নষ্ট হইবে, জীব সেই পরিমাণেই কৃপার প্রভাব উপলব্ধি করিবে। সংঘর্ষণ ভিন্ন স্থূল নাশের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বলিয়া সংঘর্ষণ হইতেই কৃপার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কাষ্ঠের ঘর্ষণ করিয়া যেমন অগ্নিকে আবাহন করিতে হয় না, অগ্নি আপনিই সমাগত হয় ও স্বকার্য্য সাধন করে, সেইপ্রকার কৌশলপূর্ব্বক অর্থাৎ যথাবিধি কর্ম্ম করিলে কৃপার জন্য আশা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। যথাসময়ে ভগবানের কৃপাশক্তি প্রকাশিত হইয়া অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করে। কারণ,

স্থূলভাবের নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহাত্ম-বোধ অর্থাৎ জড়ত্বা এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান বিলীন হইয়া যায়। অতএব যোগরূপ কর্ম্মই অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিবার প্রথম অবলম্বন। জড়কে ধরিয়াই জড়কে ছাড়াইয়া চৈতন্যে উপস্থিত হইতে হইবে।

জি। কর্ম্মই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে কি জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি উপায়ের মধ্যে গণ্য নহে ?

ব। না, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতিকে ধরিতে চাও, তবে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির সন্ধানই পাইবে না। যাহা পাইবে, তাহা আভাস মাত্র, তাহা যে প্রকৃত অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যে পন্থাই স্বীকার কর, তাহা শুধু বাহ্য চিহ্ন মাত্র। সর্ব্বত্রই কর্ম্মের আসন প্রথম। জ্ঞান-মার্গের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি এবং ভক্তি-পথের নববিধ সাধন-ভক্তি কর্ম্মেরই অন্তর্গত। মোট কথা, স্থূলসম্বন্ধবশতঃ মনুষ্য শুধু কর্ম্মেই অধিকারী। সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলে পরের অবস্থাগুলি আপনা আপনিই খুলিয়া যায়। কর্ম্মকে প্রধান বলিবার ইহাই একমাত্র কারণ।

জি। কর্ম্মের প্রাধান্য কতকাল থাকে ? চিরকাল কি কর্ম্মই করিতে হইবে ? যাহাকে কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলে, তাহার কি কোন সার্থকতা নাই ?

ব। চিরকাল কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার যে একটি পরাবস্থা আছে, আপনিই তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। যতক্ষণ সে অবস্থার বিকাশ না হয়, ততক্ষণ কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। কর্ম্মত্যাগ ইচ্ছা করিয়া হয় না—উহা যথাকালে আপনিই হইয়া যায়। বাসনা ত্যাগ ভিন্ন কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না। স্থূলের সহিত স্থূলের সংঘর্ষকেই কর্ম্ম বলে। যথাবিধি এই সংঘর্ষের ফলে যখন চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রকাশিত হয়, তখন স্থূলভাব বা জড়ত্ব আর প্রবল থাকে না—অভিভূত হইয়া যায়। যাহাকে তোমরা জড় পদার্থ বল, তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই চৈতন্যরূপ অগ্নি সুপ্ত-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন জড়ের তীব্র সংঘর্ষ নিবন্ধন অন্তঃস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য ফুটিয়া উঠে, তখন সেই চৈতন্যের তেজে জড় অথবা স্থূল ভাব অভিভূত হইয়া যায়। কাষ্ঠঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যেমন আপন কারণ ও আধার স্বরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, ইহাও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। এইভাবে স্থূলত্ব কাটিয়া গেলে কর্ম্ম আপনিই নিবৃত্ত হয়। যথা-বিধি কর্ম্ম করিলেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্ঞানের উদয়ে কর্ম্ম-ত্যাগ হইয়া যায়—কর্ম্মহীন ব্যক্তির কর্ম্ম-সন্ন্যাস অসম্ভব। দেহাত্মাভিমান থাকা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। বলপূর্ব্বক

ত্যাগ করিবার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। দেহ কর্ম্মেরই রূপ—"শরীরং কেবল কর্ম্ম"। তাই যতক্ষণ দেহ-বোধ আছে, ততক্ষণ অন্ততঃ লেশমাত্র কর্ম্ম থাকিবে। ব্যবহার কর্ম্ম-ভূমি। পরমার্থে স্থিতিকালে কর্ম্মের অতীত হইলেও ব্যবহার অবস্থায় কর্ম্ম-সম্বন্ধ কিছু না কিছু থাকিবেই। তবে অভ্যাসশীল যোগীর কর্ম্মে এবং সাধারণ লোকের কর্ম্মে ভেদ আছে। স্বভাবের অনুশীলনই ধর্ম্ম। অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। কর্ম্ম যখন স্বভাব হইতে কাটিয়া যাইবে, তখনই যাওয়া উচিত। পূর্ব্বে কাটাইতে চেষ্টা করিলে কপটতা ও মিথ্যা আচরণ হয়—তাহা সাধকের সিদ্ধি-লাভের পক্ষে হানিকারক।

জি। বাবা, শাস্ত্রানুশীলন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? আপনি ত কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানের উদয় স্বীকার করিতেছেন।

ব। বৎস, কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানের উদয় কি প্রকারে হইবে? শুধু শাস্ত্রপাঠ হইতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা শুষ্ক বা পরোক্ষ জ্ঞান। শুষ্ক জ্ঞান হইতে অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয় না—উহা অনেক সময়ে প্রকৃত জ্ঞান-পথের কণ্টকস্বরূপ। একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে পারে—এই রূপ জ্ঞানের বিকাশকেই প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলন বলে। জ্ঞানের

বিকাশ হইলে অহঙ্কার কাটিয়া বিষয়াসক্তি ছুটিয়া যায়। তখন সকল পদার্থেরই স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুতে আচ্ছাদন থাকে না।

জি। জ্ঞানের পরে কোন্ অবস্থার আবির্ভাব হয়?

ব। জ্ঞানের পরে ভক্তির উদয় হয়। জ্ঞানলাভ হইলেই এক দিকে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অপর দিকে অনুরাগের সঞ্চার হয়। অনাত্মা বা জড় বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য হয়, আর পরমাত্মার প্রতি অনুরাগ হয়। ইহাই ভক্তি। চিন্ময় অবস্থার উন্মেষ না হইলে, জড়ত্বের—বিষয়ের—আবরণ-ভঙ্গ না হইলে, শুদ্ধা ভক্তির উদয় হইতে পারে না। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যে ভক্তি, তাহাতে জড়-সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তাহা ন্যূনাধিক কাম ও স্বার্থময়, তাহা সহেতুক, উদ্দেশ্যযুক্ত। জ্ঞান-লাভে আপ্তকাম হওয়ার পরেই বিশুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হয়। তখন অন্য আকাঙ্ক্ষা ত দূরের কথা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে না। ভোগস্পৃহা কিংবা মোক্ষস্পৃহা শুদ্ধভক্তির প্রতিবন্ধক। তাই বদ্ধ বা স্থূল-ভাবাপন্ন জীবের পক্ষে শুদ্ধভক্তির উদয় অসম্ভব। জ্ঞান আলোকস্বরূপ, তাহাতে বস্তু-সাক্ষাৎকার হয়। অনন্তর বস্তুতে প্রাণের আকর্ষণ বা লগ্নতা হয়—ইহাই ভক্তি। কর্ম্ম অন্বেষণ, জ্ঞান প্রাপ্তি, ভক্তি আস্বাদন। অতএব জ্ঞানেরই পরিপক্ক অবস্থা ভক্তি।

জি। ভক্তির পরেও কি কোন অবস্থা আছে ?

ব। আছে। তাহাই প্রেম। ভক্তির গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ইহা পরমানন্দস্বরূপ। অনেকে ইহাকেই অদ্বৈতসিদ্ধি বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন। এই অবস্থা পূর্ণত্বের দ্বারদেশ—মহাশক্তি বা অসীম-তত্ত্বে প্রবেশের মুখ। ইহার পরেই অকূল পাথার—সেখানে বাক্য ও মনের গতি নাই। অসীম বা অনন্ত সত্তা তত্ত্বাতীত হইলেও তত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত কিছুই নাই। উহা এক হিসাবে ঈশ্বরত্বেরও অতীত অবস্থা—পূর্ণতমা মহাশক্তির স্বরূপ বা স্বভাব। "বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা"—বিনা প্রেমে এই পূর্ণত্বে প্রবেশ হয় না।

জি। সুতরাং প্রথমে গুরূপদিষ্ট কর্ম্মকেই অবলম্বন করিতে হয়। নতুবা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই।

ব। হ্যাঁ। ক্রমশঃ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উদয় হইয়া কর্ম্ম-নিবৃত্তি হয়। জ্ঞান হইতে ভক্তির বিকাশ হয় এবং ভক্তি পরিপক্ক হইয়া প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব এবং তাহার পর বার্দ্ধক্য যেমন ক্রমশঃ স্বভাবের নিয়মেই উদিত হয়, -কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমও তেমনি আপনিই পর পর ফুটিয়া উঠে। বাল্য না হইয়া যেমন যৌবন হয় না, তেমনই কর্ম্ম না করিয়া জ্ঞানলাভ হইতে পারে

না। বাল্যের পর যৌবন যেমন আপনিই আসে, তখন আর বাল্য থাকে না, তেমনই কর্ম্মনিবৃত্তির অবস্থায় জ্ঞানেই স্থিতি হয়, তখন আর ক্রিয়া থাকে না। বীজ বপন না করিয়া ফললাভের আশা, বন্ধ্যার পুত্র-মুখ-দর্শনের আশা আর কর্ম্মহীনের জ্ঞানলাভ কিংবা জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভের আশা দুরাশা মাত্র। বাল্য-যৌবনাদি যেমন পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একই জীবনের অন্তর্গত, কর্ম্ম জ্ঞানাদিও তেমনই একই সাধন-প্রবাহের অন্তর্গত ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। ইহাই প্রকৃত সমন্বয়। সাধনায় জীবন থাকিলে এ সমন্বয় আপনিই ঘটিয়া থাকে।

জি। অনেকেই বলেন যে, 'ভক্তিজ্ঞ্যানায় কল্পতে'। প্রথমে ভক্তি, পরে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি বা বন্ধন-নিবৃত্তি। আপনার কথা ত তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে।

ব। জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তি প্রকৃত ভক্তি নহে। তাহাতে স্বার্থানুসন্ধান অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তাহা অহঙ্কার-মূলক। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জড়-সম্বন্ধ বা দেহাধ্যাস বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সে অবস্থার ভক্তি একজাতীয় প্রার্থনা মাত্র। তাহাতে ফলের দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া পারে না। ফল যদি মোক্ষও হয়, তথাপি সেই উদ্দেশ্যে যে ভক্তি জন্মে তাহা শুদ্ধাভক্তি নহে।

আর এক কথা। জ্ঞান বস্তু-তত্ত্বের প্রকাশক। যতক্ষণ তাহার উদয় না হয়, ততক্ষণ ভক্তির আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই সমভাবে অপ্রকাশিত থাকে। যেখানে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই অপ্রকাশিত, সেখানে উভয়ের সম্বন্ধ-মূলক ভক্তির প্রকাশমানতা অঙ্গীকার করা অযৌক্তিক মনে হয়। ভক্তির অধিষ্ঠান জীব আত্মজ্ঞানরহিত। ভক্তির পাত্র ঈশ্বরও তদ্রূপ অপ্রকট —অনাবির্ভূত। ইহাই অজ্ঞানাবস্থা। এ অবস্থায় ভক্তি হইতে পারে না। জগতে যাহাকে সাধারণতঃ ভক্তি বলে, তাহা বস্তুতঃ অভাব-নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা মাত্র।

জ্ঞান ভিন্ন যে মুক্তি নাই ইহা ঠিক। তবে উহা শুষ্ক জ্ঞান নহে, যথার্থ অপরোক্ষ জ্ঞান।

অতএব মুক্তির পূর্ব্বে পরা ভক্তির উদয়ই হইতে পারে না। যখন পাপ-পুণ্য বিগলিত হয়, সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়, জড়ীয় অভাব ও ত্রিতাপ-জ্বালা নিবৃত্ত হয়, তখনই কোন কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে অহেতুক ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞান বল আর ভক্তিই বল, যোগাশ্রয় ভিন্ন কিছুই ঠিক ঠিক ভাবে হইবার উপায় নাই।

জি। অনেকের বিশ্বাস, যোগ অতি দুরূহ ব্যাপার। বর্ত্তমান সময়ে যোগে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক

কিম্বা বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

ব। যোগ যে অত্যন্ত দুরূহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ হইলেও সিদ্ধ যোগীর উপদিষ্ট যোগমার্গ অতি সরল, তাহাতে কোন প্রকার অপায়ের আশঙ্কা নাই। গ্রন্থ অবলম্বনে অথবা অজ্ঞলোকের উপদেশে প্রাণায়ামাদি বায়বীয় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে শারীরিক অপকার অবশ্যম্ভাবী। যিনি যোগের রহস্য এবং মানবের দৈহিক ও মানসিক উপাদানের বৈশিষ্ট্য অবগত নহেন, তাঁহার যোগ-ক্রিয়ার উপদেশ দানের অধিকার নাই। স্বাভাবিক যোগ অতি সরল, তাহাতে কোন প্রকার ভয় অথবা অপকারের সম্ভাবনা নাই। এইরূপ যোগী অতি বিরল বলিয়াই, যোগ এত দুর্লভ ব্যাপার।

জি। যোগ ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না কেন, তাহা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম দ্বারা যোগলভ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায় কি না, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব। বৎস, যোগের স্থান অন্য কোন প্রকার কর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই চিত্ত ও দেহের স্থায়ী বিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় না। দেখ, প্রকৃতি হইতে যে কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা

নির্ম্মাণ ও ক্রিয়াভেদে দুই প্রকার। নির্ম্মাণটি উপাদান ও ক্রিয়া নিমিত্ত। নির্ম্মাণের ধর্ম্মই আপেক্ষিক স্বধর্ম্ম, ক্রিয়া দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয়—ইহাকেই উৎপত্তি বলে। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, রাম ও শ্যাম দুইটি বালক রৌদ্রে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল।

রৌদ্র লাগিবার দরুণ রাম জ্বরে আক্রান্ত হইল, কিন্তু শ্যামের কোন রোগ হইল না। সূর্য্যের তাপ দুই জনের উপরেই সমভাবে লাগা সত্ত্বেও এক জনের জ্বর হইল কিন্তু অপর ব্যক্তির কিছুই হইল না—ইহার কারণ কি? কারণের বিভিন্নতা না থাকিলে কার্য্যে ভেদ হইতে পারে না, সুতরাং সূর্য্যের তাপ ব্যতীতও অন্য কিছু কারণ আছে—তাহাই জ্বরের অসাধারণ কারণ। রৌদ্র সাধারণ উদ্দীপক মাত্র। সেই অসাধারণ কারণ আর কিছু নহে—উহা শুধু রামের দৈহিক বৈশিষ্ট্য বা সংস্কার-বিশেষের সমষ্টি। হয়ত তাহার পিত্ত দুর্ব্বল বলিয়া সূর্য্যের তাপে তাহার দুর্ব্বল পিত্ত-যন্ত্র আক্রান্ত হইল ও জ্বরের আবির্ভাব হইল। রৌদ্র না লাগিলে তাহা তখন অবশ্য হইত না। কিন্তু চাপা থাকিত মাত্র। অন্য কোন উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলেই ঐ সংস্কার জাগিয়া উঠিত। এই উপাদানগত বৈচিত্র্যই নির্ম্মাণ-

বিকার—রৌদ্রলাগানরূপ ক্রিয়া নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বুঝিতে হইবে, জ্বরের মূলান্বেষণ কালে শুধু নিমিত্ত আবিষ্কারই যথেষ্ট নহে। নিমিত্ত গৌণ কারণ, উপাদান-বৈশিষ্ট্যই কার্য্যের মুখ্য কারণ। জীব এখন স্থূলভাবাপন্ন—ইহা তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা নহে, বিকারাবস্থা। এই বিকারকে দূর করাই জীবের স্বাস্থ্য-সম্পাদন। ধাতুর সাম্য-ভাবই প্রকৃতি বা স্বাস্থ্য, বৈষম্যই ব্যাধি। এখন প্রশ্ন এই—বিকৃত জীবকে প্রকৃতিস্থ করা কি প্রকারে হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে নির্ম্মাণগত পরিবর্ত্তন আবশ্যক, শুধু ক্রিয়াগত বা নৈমিত্তিক পরিবর্ত্তনে স্থায়ী ফল হইবে না। নির্ম্মাণে যাহা নাই, ক্রিয়াতে তাহার বিকাশ হয় না। কামের উপকরণ সম্মুখে থাকিলে আমার কাম জাগিয়া উঠে, ক্রোধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই ক্রোধ জাগিয়া উঠে—ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমার নির্ম্মাণে অথবা উপাদানে কাম-ক্রোধের বীজ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত অবসর পাইলেই তাহার স্ফুরণ হয়। কামাদির নিমিত্ত না থাকিলে যদি আমাতে কামাদি না জাগে তাহা আমার নিষ্কামত্ব প্রভৃতির নিদর্শন নহে। যখন প্রবল উত্তেজক কারণ সত্ত্বেও কামাদির আবির্ভাব না হইবে,

তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমাতে কামাদি নিষ্ক্রিয় হইয়া গিয়াছে। 'বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ'—এ কথা ধ্রুব সত্য। অতএব যদি আমাকে আত্মশোধন করিতে হয়, তবে আমাকে নির্ম্মাণ বা উপাদানের শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমি কেবলমাত্র চলা-ফেরা ও ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখি,—তাহাও আবশ্যক—তাহা হইলে লোকদৃষ্টিতে সংযম-লাভ হইলেও মূল শুদ্ধি হইবে না। কখনও না কখনও আকস্মিক বন্যার তীব্র বেগে সংযমের কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই উপাদান-শুদ্ধির উপায় একমাত্র যোগ। যাহাকে স্থূল দেহ বল, তাহা বাসনার সমষ্টিমাত্র। সুতরাং যে প্রণালীতে স্থূলভাব কাটিয়া যায়, তাহাতেই বাসনারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাসনা-ত্যাগের আর কোন নূতন প্রণালী নাই। স্থূলের সহিত স্থূলের তীব্র সংঘর্ষ না হইলে উহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, আর তাহা প্রজ্বলিত না হইলে স্থূলের নিবৃত্তিও হয় না। এই সংঘর্ষই যোগাত্মক কর্ম্ম। স্থূলের দাহ এবং বাসনা-ক্ষয় অভিন্ন ব্যাপার—ইহা জ্ঞানোদয় বা আত্মসাক্ষাৎকারের সমকালীন।

জি। আপনি বলিলেন, সংঘর্ষকেই যোগ বলে। কোন

দুইটি বস্তুর পরস্পর সংঘর্ষকে আপনার মতে যোগ নাম দেওয়া যাইতে পারে ?

ব। আপাততঃ স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষই বুঝিয়া লও। কিন্তু বিষয়টি বড় জটিল। বাস্তবিক পক্ষে স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ প্রতিনিয়তই হইতেছে। ইহা কিন্তু যোগ নহে। আবার কৌশল থাকিলে ইহা যোগও বটে। স্থূল-সূক্ষ্মের রহস্য এখানে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ জানিয়া রাখ, স্থূল জড়, সূক্ষ্ম চেতন এবং লিঙ্গই মনঃ (ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত)। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বকে আত্মা বা পরমাত্মা কিংবা ঈশ্বরও বলিতে পার। লিঙ্গই জীবভাবের বাহ্য চিহ্ন। আমাদের দেহই স্থূলপদ-ব্যপদেশ্য। বাহ্য স্থূল পদার্থই বিষয়। মনঃ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ নিরন্তর হইতেছে, ইহা স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষ ব্যতীত অপর কিছু নহে। তবে মনে রাখিতে হইবে, লিঙ্গ তটস্থ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যবর্ত্তী। বদ্ধাবস্থায় স্থূলের সংযোগ বশতঃ লিঙ্গ স্থূল, মুক্তাবস্থায় স্থূলসম্বন্ধ রহিত হয় বলিয়া ইহা সূক্ষ্ম। অতএব স্থূলের সহিত লিঙ্গের সংঘর্ষও বাস্তবিক স্থূলের সহিত স্থূলেরই সংঘর্ষ। বাসনাযুক্ত মনঃ স্থূল বই আর কি? এই সংঘর্ষ কিন্তু যোগ নহে। লিঙ্গের সহিত শুদ্ধ আত্মা বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংঘর্ষই যোগ। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে

বদ্ধ জীবের লিঙ্গ অবশ্যই স্থূলভাবাপন্ন। পরমাত্মা ও মন্ত্রাদিরূপে ভূত-কঞ্চুক-বেষ্টিত বলিয়া স্থূলপদবাচ্য। এই সংঘর্ষই জীবাত্মরূপী লিঙ্গ ও পরমাত্মরূপী সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংযোগ, কিংবা মনঃ ও আত্মার সংযোগ। অবশ্য ইহার স্তর আছে। লিঙ্গ ও সূক্ষ্মের পরস্পর ঘর্ষণ হইলেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গাবরণ বাসনা ও সূক্ষ্মাবরণ ভূত-কঞ্চুক নষ্ট হইয়া যায়—বাহ্য আবরণ ছিন্ন হয়। ইহার ফলে শুদ্ধ-প্রায় লিঙ্গ ও শুদ্ধ-প্রায় পরমাত্মা জাগিয়া উঠেন। ইহাই এক হিসাবে প্রাকৃতিক চিত্তশুদ্ধি ও দেবতা-সাক্ষাৎকার। লিঙ্গ তখন একপ্রকার শুদ্ধসত্ত্ব। উহাতে মলের কিঞ্চিৎ লেশ আছে মাত্র; আর পরমাত্মা অপরা দেবতারূপে অভিব্যক্ত। এই পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ভাব। ইহা প্রজ্ঞার বিকাশ হইলেও নির্ম্মল অবস্থা নহে, ইহার পরে দ্বিতীয়বার উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় উহাকে উপাসনা বা নিদিধ্যাসন বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে তাহাও কর্ম্ম। প্রথম সংঘর্ষ বহির্যাগ বা বাহ্য কর্ম্ম, দ্বিতীয় সংঘর্ষ অন্তর্যাগ বা অন্তঃকর্ম্ম। উভয়ই কর্ম্ম বা উপাসনা। দ্বিতীয় সংঘর্ষের চরম অবস্থায়ই চৈতন্য-সমাধি হয়, অমল জ্ঞান নির্ম্মল হয়, লিঙ্গ পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হয় এবং দেব-ভাব ঐশ্বর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। এই অবস্থায় লিঙ্গ

বিশুদ্ধ আত্মায় যুক্ত হইয়া অব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু মনে রাখিও, লিঙ্গ কখনই শুদ্ধ আত্মভাবে পরিণত হয় না। উভয়ই অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া পরস্পরের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা অভিভূত-প্রায় হইয়া থাকে, সেই জন্য তাহার ভেদ ধরা যায় না। কিন্তু আত্মজ্ঞান বা শুদ্ধ আমিত্ব-বোধ হইতে জীবের সত্তা অনুমিত হয়। লিঙ্গহীন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে আত্মবোধও নাই, পরবোধও নাই।

জি। শাস্ত্রেও এ-সম্বন্ধে বহু কথা আছে। সাংখ্য ও যোগের আচার্য্যগণ যাহাকে কৈবল্য বলিয়া বর্ণনা করেন, ইহা কতকটা সেই প্রকার অবস্থা। ঐ যে আপনি দ্বিতীয় সংঘর্ষের পরে জ্ঞানের নির্ম্মলতার কথা বলিলেন, উহাই তাঁহাদিগের জ্ঞান-সম্প্রসাদ। সত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি-সাম্য বলিয়া যে অবস্থার লক্ষণ করা হইয়াছে, ইহা কতকটা সেই অবস্থা বলিয়াই মনে হয়। লিঙ্গ সত্ত্ব, আত্মা পুরুষ,—উভয়ের শোধন সমান হইলে, কৈবল্যা-বস্থা হইয়া থাকে। বেদান্তের তৎ-পদার্থের ও ত্বং-পদার্থের শোধন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আচ্ছা, এ অবস্থায় কি জ্ঞান থাকে?

ব। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বলি, তাহা এ অবস্থায় থাকে না, থাকিতে পারে না।

কারণ, লিঙ্গের ক্রিয়া ভিন্ন কোন বৃত্তির উদয় হইতে পারে না। লিঙ্গ যখন বাসনা ও সংস্কাররহিত, স্থূলসম্বন্ধহীন, তখন উহাতে ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। শুদ্ধ পরমাত্মভূমিতে লিঙ্গ অভিভূত, তাই নড়িতে পারে না। অতএব কৈবল্যে জ্ঞান বা ইচ্ছার সদ্ভাব কল্পনীয় নহে। তবে শুদ্ধ বাসনা বা শুদ্ধসত্ত্ব অবলম্বনে তাহাতে জ্ঞানাদির উদয় হইতে পারে।

চিত্তের বৃত্তি লিঙ্গের ক্রিয়ামূলক। সুতরাং লিঙ্গ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন যে চিত্ত বৃত্তিহীন তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ মুখ্য যোগ। গৌণযোগে একাগ্রবৃত্তি অবশ্য থাকে।

আবার বলিতেছি। লিঙ্গ তটস্থ—যখন ইহা স্থূলে অভিনিবিষ্ট, স্থূলের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ও স্থূল অবলম্বনবিশিষ্ট, তখন ইহাতে যে ক্রিয়া হয়, তাহা হইতেই বিষয়জ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার লিঙ্গশুদ্ধির পরে লিঙ্গ যখন সূক্ষ্মগত, যখন ইহা সূক্ষ্ম অবলম্বনবিশিষ্ট ও সূক্ষ্মের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, তখন ইহাতে যে ক্রিয়া হয়, তাহা হইতে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আনন্দ-ঘন লিঙ্গ নিষ্ক্রিয়—অসংকল্প। অতএব বিষয়জ্ঞান কিংবা আত্মজ্ঞান উভয়ত্রই লিঙ্গের বা মনের ক্রিয়া আবশ্যক। বিষয়জ্ঞান স্থলেও কিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞান অস্পষ্টভাবে থাকে, তাহা ধর্ত্তব্য

নহে। আত্মজ্ঞানস্থলেও কিঞ্চিৎ বিষয়জ্ঞান অস্পষ্ট-ভাবে থাকে। কারণ, সূক্ষ্ম, লিঙ্গ ও স্থূল বৈষম্যাবস্থায় মিশ্রভাবে থাকে—কাহারও প্রাধান্য হয়, ইহাই মাত্র বিশেষ। সাম্যাবস্থায় লিঙ্গ নিরালম্ব হওয়াতে তাহাতে ক্রিয়া থাকে না বলিয়া জ্ঞান প্রভৃতি নিরুদ্ধ হয়। তখন একমাত্র স্বভাবই থাকে। স্বভাব স্বতন্ত্র, স্বপ্রতিষ্ঠ—আর সবই পরাধীন। এ জগতে কোন বস্তুই অবলম্বন ছাড়িয়া সত্তারক্ষা করিতে পারে না। অবলম্বন ছাড়া হইলেই বস্তুর পৃথক্ সত্তাবোধ থাকে না—উহা স্বভাবে মিশিয়া যায়। এই জন্যই জগতের সবই আপেক্ষিক—শুধু স্বভাবই পূর্ণ। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম—ইহাকে প্রাপ্ত হইবার সোপানত্রয়।

বদ্ধাবস্থার জ্ঞান, জ্ঞান নহে, অজ্ঞান। যোগের প্রভাবে ইহা নিবৃত্ত হয় ও প্রজ্ঞার উদয় হয়—অর্থাৎ সকল বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অভিন্ন সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। ইহার প্রথমাবস্থায় ভেদাভেদ থাকে—অর্থাৎ তখন বিষয়ের ভেদ ও তাহার অন্তর্গত আত্মার অভেদ উভয়ই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। এই ভূমিতেই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। বলা বাহুল্য, ইহাও আত্মদর্শন-মূলক। আত্মজ্ঞান না হইলে সর্ব্বজ্ঞান হইতে পারে না। যতদিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন

জ্ঞানবৃত্তি প্রতিহত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়। আত্মজ্ঞান হইলে জ্ঞান নির্ম্মল ও বাধাহীন হয়। তখন বহির্নিবেশ থাকা পর্য্যন্ত আত্মভিত্তিতে বিশ্বদর্শন—জগতের যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান—হইয়া থাকে। ক্রমশঃ অভেদভাব প্রবল হইতে থাকে—আত্মবোধ বিষয়বোধ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় সর্ব্বজ্ঞান অভিভূত হইয়া আত্মজ্ঞানই প্রধানভাবে বিরাজ করিতে থাকে—বিষয়ের দিকে লক্ষ্য থাকে না, আত্মার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ইহাই অভেদ অবস্থা। ইহার পরে অভেদ-বোধও কাটিয়া যায়—যাবতীয় বিকল্প তিরোহিত হয়। তখন ভেদাভেদের অতীত অবস্থা,—তখন সর্ব্বজ্ঞানও থাকে না, আত্মজ্ঞানও থাকে না। অর্থাৎ এ সকল অতিক্রান্ত হইয়া লিঙ্গের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন হয়। ফলে যাহা থাকে, তাহা ঈশ্বরও নহে, জীবও নহে, জড়ও নহে। তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্য বা স্বভাব। ইনিই পূর্ণ, শুদ্ধ, সনাতনী মহাশক্তি। ইনি তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, ব্যোমাতীত ব্যোম, গুণাতীত হইয়াও গুণময়ী, গুণময়ী হইয়াও নিত্য নির্গুণা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, পরমরহস্যস্বরূপা।

আত্মজ্ঞানের পরে ভক্তি ও প্রেমের চরমাবস্থা পর্য্যন্ত এই স্বভাবপ্রাপ্তির ইতিহাস। ইহা চিদ্বিলাস-

ময়। ঐশ্বর্য্য, জীবত্ব বা জড়ত্ব সব, এখানে সম-রস হইয়া এক বিচিত্র বিলাসের উদ্ভব হয়। এই বিলাসের সূচনাই ভক্তি এবং সমাপ্তিই প্রেম। ইহার পরেই স্বভাব—যাহার বর্ণনা চলে না। স্বভাবই স্বতন্ত্র, ইঁহাতে আশ্রিত হওয়াই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যলাভ।

ঈশ্বর, জীব ও জগৎ—এই মহাশক্তির ক্রীড়াপীঠ। ইনি যেমন সকলকে চালান, সকলই তেমনই চলে, ইঁহাকে ছাড়িয়া কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই।

জি। ইনিই যদি সকলকে চালান, তবে জীবের দায়িত্ব কি? শুভাশুভের জন্য জীবের সামর্থ্য কোথায়? তবে অন্য-কৃত কর্ম্মের জন্য জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগ হয় কেন? জীব তাহা হইলে এই প্রবল শক্তির দাস। তাহার কোন কর্ম্মের জন্য তাহার ভোগ উচিত নহে।

জি। বৎস, স্বভাবই যে সকলকে চালান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে একটু কথা আছে। জীব যখন কর্ম্ম করে, তখন সে অভিমান-বশতঃ নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, তাই তাহার ফলভোগ হয়। দেহাত্মবোধ আছে বলিয়া এ অভিমান অবশ্যম্ভাবী। যখন দেহাত্মবোধ থাকিবে না, চৈতন্য ও জড়ের গ্রন্থি উন্মুক্ত হইবে, কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্য লাভ করিবেন, তখন এ অভিমান থাকিবে না। যতক্ষণ

তাহা না হয়, ততক্ষণ অভিমান-বৃত্তি একেবারে নষ্ট হইতে পারে না। লৌকিক অভিমান তিরোহিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান এবং আত্মজ্ঞতার অভিমান থাকিয়া যায়। লৌকিক অভিমান ক্রিয়াশ্রিত এবং স্থূলসম্বন্ধমূলক। কিন্তু অলৌকিক অভিমান জ্ঞানাশ্রিত ও সূক্ষ্মসম্বন্ধমূলক। সুখ-দুঃখের অনুভব বা ভোগ স্থূল দেহে হইয়া থাকে বলিয়া স্থূলদেহকে ভোগায়তন বলে। অহঙ্কার-মূলক ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল স্থূল দেহ। অতএব ক্রিয়াশ্রিত কর্ত্তৃত্ব-বোধ হইতে ভোগের উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান সগুণ ব্রহ্মে এবং আত্মজ্ঞতার অভিমান নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশের সময়, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি লাভ কালে, উদিত হয়। এই অলৌকিক অভিমান ক্রিয়াশ্রিত নয় বলিয়া ইহার ফলে সুখ-দুঃখ-বোধ বা ভোগের উৎপত্তি হয় না। ইহা জ্ঞানাশ্রিত বিশুদ্ধ অহং-ভাব মাত্র। ইহাই আত্মবোধের স্বরূপ —প্রচলিত ব্যবহার অনুসারে ইহাকে অভিমান না বলিলেও ক্ষতি হয় না। তবে মনে রাখিও, ইহাও প্রকৃত সাক্ষী নহে। আত্মজ্ঞানই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু ইহা বৃত্তিরূপ জ্ঞান, এই বৃত্তি একাগ্রভূমিতে আত্মাকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইলেও ইহা বৃত্তি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার নিরোধ হইয়া যখন

সর্ব্ববৃত্তির উপশম হয়, তখনই যথার্থ অভিমান-নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য বা সাক্ষিভাব-প্রাপ্তি হয়। তখনই প্রকৃত বোধের বিকাশ হয়—চৈতন্যের আলোকে জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরপারে স্বভাবের চালকতা বুঝিতে পারা যায়। অজ্ঞানবশতঃই জীবের দায়িত্ব, অজ্ঞান কাটিয়া গেলে তাহার দায়িত্ব কোথায়? অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব জীব গ্রহণ করে, তাই পুরুষের স্বরূপানুগত সাক্ষিত্ব ফলের সহিত রঞ্জিত হইয়া ভোক্তৃত্ব রূপ ধারণ করে। উভয়ত্রই বাসনা মূল।

যখন জীব নিজেকে সর্ব্বাংশে আশ্রিত বলিয়া বোঝে, স্বভাবস্থ বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না বলিয়া ভোগও থাকে না। যতক্ষণ অহঙ্কার বিগলিত না হইতেছে, ততক্ষণ জোর করিয়া পুণ্যপাপের অতীত হওয়া চলে না। জীব যে স্বভাবের দাস, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রথমতঃ, পরিচ্ছিন্ন স্বভাবের দাস—যাহা তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার-সমষ্টি ভিন্ন অপর কিছু নহে। চরমে জ্ঞানোদয়ে নিত্যস্বভাবের দাস—তাহা পরমানন্দাবস্থা।

জি। কার্য্য হয় কি প্রকারে? স্থূল দেহ ভিন্ন কার্য্য হয় না, অথচ শুধু দেহেরও কোন সামর্থ্য নাই।

বা। স্থূল জড়, লিঙ্গ যেমন তাকে চালায়, সে তেমনিই চলে। কিন্তু বাস্তবিক সঞ্চালন-শক্তি লিঙ্গেতেও নাই। তাহা

আত্মায় আছে। আত্মার সঞ্চালন-শক্তি লিঙ্গকে চালিত করে, লিঙ্গ চালিত হইয়া স্থূলদেহকে চালিত করে। সেই জন্য লিঙ্গ আত্মায় যুক্ত হইলে স্থূলদেহ নিশ্চল হইয়া যায়। স্থূলদেহ নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থূল জ্ঞানাদিরও আবির্ভাব হয় না। তখন লিঙ্গ আত্মগত হইয়া কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হয় মাত্র—তাহার ফলে আত্মজ্ঞান উদিত হয়। পরে লিঙ্গ নিঃস্পন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। তাহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি—চৈতন্যস্থিতি। তখন যেমন অন্তঃকরণের ক্রিয়া হয় না, তেমনই দেহেরও ক্রিয়া হয় না। দেহের বায়বিক ক্রিয়া বা প্রাণক্রিয়াও মূলতঃ লিঙ্গক্রিয়া-সাপেক্ষ। তাই প্রকৃত সমাধিতে দেহ শববৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। চৈতন্য-সমাধি চিন্ময়-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ। জড়-সমাধি সমাধিই নহে। জড়-সমাধিতে লিঙ্গ চৈতন্যে স্থিতিলাভ করে না—জড় প্রকৃতিতেই প্রতিবদ্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয়বৎ বর্ত্তমান থাকে।

জি। আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে, সাধনার পদ্ধতি-সম্বন্ধে এতদিন আমার যে ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্তিমূলক। যোগ ভিন্ন নিত্য কল্যাণের পথে পদার্পণ করা যায় না। যোগী না হইয়া প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্ত হওয়ার উপায় নাই। চিত্তকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করিবার কৌশলই যখন যোগ এবং চিত্তের

একাগ্রতা প্রভৃতি যখন জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষের জন্যও আবশ্যক, তখন যোগের প্রাধান্য অস্বীকার করা চলে না। যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান-যোগ নহে, উহা শুষ্ক জ্ঞান মাত্র। তদ্রূপ যোগহীন ভক্তিও প্রকৃত ভক্তি নহে। উহা ভক্তির অনুকরণ মাত্র। একটি সামান্য বিষয়ের তত্ত্বাবিষ্কার যখন যোগ ভিন্ন হয় না, তখন সকল তত্ত্বের ঊর্দ্ধস্থিত পরম তত্ত্বের উপলব্ধি যে বিনা যোগে হইতে পারিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

আপনার অভিপ্রায় আমি কতকটা এইরূপই বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান যুগে যোগানুষ্ঠানের অধিকারী কে এবং যোগ-সাধনার উপদেশক আচার্য্যই বা কোথায়?

ব। বৎস, যোগে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে। তবে সকলের অধিকার সমান নহে—উত্তমাদি ভেদে অধিকারের তারতম্য আছে। যে যতটা ধারণ করিতে পারে তাহাকে ততটা ভারই দিতে হয়। হস্তীর ভার ছাগলকে দিলে সে তাহাতে পিষ্ট হইয়া যায়, আবার ছাগলের ভার হস্তী গ্রাহ্যই করে না। অল্পাধিকারীকে প্রথমতঃ অল্প অধিকারই দিতে হয়, ক্রমশঃ তাহার সামর্থ্য অনুসারে অধিকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সংযম ও নৈতিক উৎকর্ষ যেমন অন্যান্য বিষয়ে আবশ্যক, তেমনি যোগ-পথেও উন্নতির ভিত্তি-স্বরূপ।

যাহারা বলে, কলিতে জীবের যোগে অধিকার নাই, তাহারা যোগের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানে না। প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দৈহিক ব্যায়াম অথবা বায়ুর ক্রিয়া-বিশেষকেই যোগ মনে করিয়া থাকে। তাই তাহারা যোগ হইতে রোগোৎ-পত্তির আশঙ্কা আছে মনে করিয়া বর্ত্তমান কালে যোগ অনুপাদেয় বলিয়া বিবেচনা করে। বস্তুতঃ, যোগ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় না—যাহা হইতে ভবরোগ পর্য্যন্ত চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়, তাহা হইতে রোগোৎপত্তির আশঙ্কা হাস্যাস্পদ নহে কি? যোগের উপদেষ্টা গুরুর অভাব হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই যোগ-সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছে। আজ-কাল ঘরে ঘরেই যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিমানী গুরুর মৌখিক উপদেশ ও লিখিত গ্রন্থাদি হইতে দেশের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। মনে রাখিও, প্রকৃত যোগী অতি বিরল। এক কোটী লোকের মধ্যে একজন প্রকৃত যোগী খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। যিনি সাক্ষাৎ মহাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে জগতের উদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তিনিই যোগী—অন্য সকলে নামধারী মাত্র।

জি। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে প্রকৃত যোগানুষ্ঠান কার্য্যক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। কারণ, আপনার আদর্শানুরূপ যোগী বা মহাপুরুষ সংসারে সত্য সত্যই বিরল। সূক্ষ্মভাবে অথবা ছদ্মবেশে বহু মহাপুরুষ এবং সিদ্ধপুরুষ বিচরণ করিলেও যতক্ষণ আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইব এবং দেখিয়া চিনিতে না পারিব, ততক্ষণ তাঁহারা থাকিলেও আমাদিগের কোন লাভ নাই।

ব। মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত প্রণালীতে সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে। মহাপুরুষের আশ্রয় ভিন্ন শুধু গ্রন্থ-পাঠ অথবা ধর্ম্মব্যাখ্যা-শ্রবণ করিয়া সাধন-পথে প্রবেশ করা যায় না। সুতরাং কঠিন হইলেও মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ একান্তই আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধনার মূল—মহাপুরুষের আশ্রয়

জি। মহাপুরুষ কাহাকে বলে ? মহাপুরুষকে আশ্রয় করিতে হইবে, কিন্তু কি উপায়ে তাঁহাকে চিনিতে পারিব ? এমন কোন লক্ষণ বা নিদর্শন কি নাই—যাহার দ্বারা মহাপুরুষের পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে উপলব্ধ হইতে পারে ? আজকাল বাহ্যাড়ম্বরের প্রবলতা এত অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে। বাবা, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা বলুন।

ব। বৎস, ফুল ফুটিলে মধুলিপ্সু ভ্রমরকে কে দেখাইয়া বা চিনাইয়া দেয় ? যে স্বভাবে থাকিতে চেষ্টা করে—স্বভাবই তাহাকে শিক্ষা দেন। আমরা স্বভাবকে ভুলিয়া কৃত্রিমতার মোহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি—সেই জন্য যাহা নিতান্তই সহজ, তাহাও কঠিন বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ কৃত্রিমতা আছে, ততক্ষণ লক্ষণের আবশ্যকতা—নতুবা কোন নিদর্শন দেখিবার আবশ্যকতাই হয় না। শিশু নিজের মাকে চিনিতে

পারে—যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে সে স্বতঃই বুঝিতে পারে, কে তাহাকে ভালবাসে, সেজন্য বিচার-বিতর্কের আবশ্যকতা হয় না। যে পুষ্প যে ঋতুতে ফুটে, তাহা আপনিই তখন ফুটে, যে পাখী যে কালে গান করে, সে আপনিই তখন গায়—কাহারও উপদেশের আবশ্যকতা হয় না। স্বভাবই সেস্থলে পরিচালক। যে যে-জিনিষের জন্য তীব্রভাবে ব্যাকুল হয়, যাহাকে না পাইলে তাহার সোয়াস্তি নাই, শয়নে স্বপনে জাগরণে যাহার জন্য সে আন্‌মনা হইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে—ঠিক যখন সে বস্তুটি উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না। সে নিজেই বুঝিতে পারে, তাহার কাম্য বস্তু আসিয়াছে। ঠিক সেই প্রকার যখন জীবের নিরাশ্রয় ভাব উদিত হয়, যখন সে সত্য সত্যই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠে, তখন সে মহাপুরুষের দর্শন পায় ও মহাপুরুষকে দেখিবামাত্রই তাঁহাকে আশ্রয়দাতারূপে অস্ফুটভাবে চিনিতে পারে। তাহাকে লক্ষণ মিলাইয়া চিনিতে হয় না। খাঁটি জিনিষ স্বভাবসিদ্ধ। খাঁটি পরিচয়ও স্বাভাবিক। বাহ্য লক্ষণ মিলাইয়া চিনিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র।

জি। তবে লক্ষণ-শাস্ত্র কি নিরর্থক? আপনি কি বলিতে চান, বাহ্য লক্ষণ মিলাইবার আবশ্যকতা নাই?

সত্য ও মিথ্যার একরূপতা বা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। অনেকেই যে এই ভাবে প্রতারিত হয়, তাহা সত্য। যদি তাহারা লক্ষণজ্ঞ হইত, যদি তাহারা চিনিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় খাঁটি জিনিষকে ধরিয়া ফেলিত।

ব। দেখ, লক্ষণ-শাস্ত্র ব্যর্থ নহে। আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যাহার যখন যে-বস্তুর যথার্থ আবশ্যকতা হয়, সে তখন সে-বস্তুকে প্রাণের টানেই বুঝিয়া লয়—বুঝাইবার জন্য অন্যের উপদেশ দরকার হয় না। তবে যখন সে সময় উপস্থিত না হয়, তখন নানাপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। যে সরল-হৃদয়, যাহার কাল আসন্নতম হইয়াছে, তাহাকে কেহই প্রতারিত করে না। তুমি আপন অন্তঃকরণ হইতে কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, বদ্‌-খেয়াল, অসদ্‌ভাব—এ সব বিদূরিত করিয়া ফেল, দেখিতে পাইবে, এ জগতে কেহই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিবে না। ক্রিয়া অনুসারেই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। যাহার নিজের মধ্যে হিংসা আছে, সেই ভীত হয় এবং তাহার নিকটেই হিংসার প্রকাশ হইয়া থাকে। যে জগৎকে অভয় দিতে পারে, তাহার আবার কিসের ভয় হইবে? যাহার মধ্যে প্রেমতত্ত্ব অচল কমলের ন্যায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কাছে সিংহ ব্যাঘ্র সর্প

প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হিংসাবৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়—তাহারাও প্রেমভাবে বশীভূত হইয়া নানাপ্রকারে তাহার আপ্যায়ন করিতে থাকে। শত শত বার এই সব আমি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অধিকারানুসারে অনেককে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছি।

তুমি কাহাকেও স্বপ্নেও প্রতারণা করিও না—কেহই তোমাকে প্রতারণা করিতে পারিবে না। প্রতারিত না হইবার ইহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। জীব যখন বাস্তবিকই সংসার-তাপে তাপিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে, যখন দুঃখানলে দগ্ধ হইতে হইতে তাহার অন্তরের যাবতীয় মল অপগত হইয়া যায়, যখন তাহার সরল ও স্বচ্ছ প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন নিশ্চয় জানিও, সেই আদ্যাশক্তিই তাহার নিকট মহাপুরুষরূপে, অভয়প্রদ আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, তাহার শোকাপনোদনের জন্য প্রকটিত হন। সে সময়ে তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে, এরূপ শক্তি জগতে কাহারও নাই। তবে যতক্ষণ তাহার চিত্ত মলিন থাকে, ততক্ষণ তাহাকে পরীক্ষার জন্য, পরীক্ষাদ্বারা তাহাকে শোধিত করিবার জন্য, নানাপ্রকার ইন্দ্রজালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তখন অবশ্য সে প্রতারিত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। কিন্তু কাল পূর্ণ হইলে আর প্রতারণা থাকে না।

কারণ, প্রতারণাত্মিকা ছলনাময়ী মায়া স্বয়ং তাহার কল্যাণদায়িনী মাতৃরূপে মহামায়া-রূপ পরিগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ সংসার-জ্বালায় ব্যাকুল-হৃদয় জীব-শিশুকে আপন সুশীতল অঙ্কে স্থাপনা করিয়া তাহার তাপ দূর করিয়া থাকেন।

জি। বাহ্যলক্ষণ দ্বারা কি তবে চেনা যায় না?

ব। যাবে না কেন? যে জানে, সে অবশ্যই তাহা পারে। তবে তাহাও সহজ নহে। যিনি মহাপুরুষ, তিনি যদি আত্মপরিচয় দিতে ইচ্ছা না করেন, যদি তিনি ধরা দিতে না চান, তবে কাহার সাধ্য তাঁহাকে লক্ষণ দ্বারা চিনিয়া লয়? জানিয়া রাখ, তিনি অলক্ষ্য বস্তু—নিজের উপাধি সঙ্কোচ করিলে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারে না, এমন কি দেখিয়াও লক্ষ্য করিতে পারে না। আর, তিনি যদি নিজে ধরা দেন, তবে যে-ভাবে আবির্ভূত হইলে জীব ধরিতে পারিবে, সেই ভাবেই আবির্ভূত হন। লক্ষণ জানা না থাকিলেও জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

আসল কথা, কৌশল বা বলপূর্ব্বক মহাপুরুষকে বুঝিবার চেষ্টা করা বাতুলের প্রয়াস মাত্র। যদি তাহা পারা যাইত, তাহা হইলে মহাপুরুষ অথবা অবতারাদিকে সকলেই সমভাবে চিনিতে পারিত—মতভেদ পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু তাহা কি

কোথাও হইয়াছে? তুমি ত ইতিহাস জান—তুমি নিজেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

মহাপুরুষগণ বালকের ন্যায়, জড়বৎ, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আচরণ করেন—তোমার এমন কি ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে যে, তুমি বাহ্যভাবের বৈচিত্র্যের অন্তরালে যাহা মহাপুরুষ-মাত্রের নিত্য ও সামান্য-রূপ ও যাহা সদা-প্রকাশমান তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পার? জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন না হইলে কোন বস্তুরই যথার্থরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না—যে অজ্ঞানী, সে মহাপুরুষকে চিনিবে কি প্রকারে? সে ত নিজেকেই চিনিতে পারে না।

যদি বল দৈহিক লক্ষণ অথবা ব্যবহার বা আচারের দ্বারা অজ্ঞানীর পক্ষেও মহাপুরুষকে চিনা সম্ভবপর—তবে প্রশ্ন এই, যদি শক্তিশালী পুরুষ গুপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোন লক্ষণই তাঁহার অঙ্গে প্রকট হইবে না। তখন চিনিবার উপায় কি থাকিবে? ব্যবহার বা আচারে তাঁহারা বদ্ধ নহেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আচার নাই—বস্তুতঃ তাঁহারা বিধি-নিষেধের অধীন নহেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী, লীলাময়। তাঁহাদের খেয়ালের ভিতরে ঢুকিয়া স্বরূপ দর্শন করা কি সহজ কথা?

তবে একটি কথা আছে। যখন তাঁহারা তটস্থ থাকেন—অর্থাৎ কাহারও প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল-

ভাব-বিশিষ্ট না থাকেন—তখন লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায় বটে।

এই লক্ষণ যে শুধু স্থূল-দেহ-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে—স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ সকল দেহেই প্রয়োজ্য। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে স্থূলের অতীত বস্তু অতীন্দ্রিয় বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন লক্ষণ কার্য্যসাধক হয় না। অবশ্য, সাধন-বলে আপন সত্তার বিকাশ হইলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর ও বিশুদ্ধতর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ও তদনুসারে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করা যায়।

যাঁহারা ইচ্ছামাত্র অন্যের লিঙ্গশরীর দেখিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা লিঙ্গদেহের বর্ণ, গতি প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য হইতে উক্ত লিঙ্গাভিমানী জীবের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বুঝিতে পারেন। যাহা কিছু জানা আবশ্যক, সব উহা হইতেই জানিতে পারেন। কিন্তু মহাপুরুষগণ লিঙ্গাতীত—কারণ, তাঁহারা মুক্ত। সুতরাং, যাঁহাদের কারণদেহ বা মহাকারণদেহ পর্য্যন্ত দেখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাই স্বয়ং লিঙ্গাতীত হইয়া মহাপুরুষ দর্শন করিতে সমর্থ।

কিন্তু সাধারণ জীব স্থূল দর্শনের অগোচর কোন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেই জন্য উক্ত অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য হইতে বস্তুজ্ঞান করা তাহার পক্ষে

সম্ভবপর হয় না। এই জন্যই স্থূল লক্ষণ দ্বারা জানিবার চেষ্টা।

জি। মানুষ সিদ্ধিলাভ করিলে তাঁহার দেহে কোন পরিবর্ত্তন বা লক্ষণ প্রকাশ হয় কি? যদি হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা হয়ত পরিচয়ের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে।

ব। তপস্যা করিলে দেহের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়—এমন কি পরমাণু পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। যাঁহার ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার স্থূলদেহ স্থূল হইলেও অন্যান্য লোকের দেহের ন্যায় নহে। বার বার সঙ্গ করিতে হয়—দীর্ঘকাল সঙ্গে থাকিলে বহু অলৌকিক লক্ষণ ঐ দেহে দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ, যাঁহার কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইয়াছে, যিনি সিদ্ধি এবং যোগ-লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে একটু বৈশিষ্ট্য থাকে। এই জন্য ঐ বৈশিষ্ট্য দ্বারা একখানা ফোটোগ্রাফ হইতেও কাহারও যোগসিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যোগী, রোগী ও ভোগী—শুধু চক্ষুর চাহনি হইতেই ধরা পড়ে। যোগীদের ললাটেরও পরিবর্ত্তন হয়। তা-ছাড়া, যাঁহার কুণ্ডলিনী জাগিয়াছে ও সুষুম্না-পথ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, তাঁহার দেহে সর্ব্বদা পদ্ম-গন্ধ খেলে, তাঁহার নিশ্বাসে পদ্ম-গন্ধ বহিতে থাকে, তাঁহার নাভির নিকটে কোন পাত্র রাখিয়া উপর

হইতে জল ঢালিলে ঐ জল নাভিস্পর্শে পদ্মের সুগন্ধি আতরের ন্যায় হইয়া পাত্রে সঞ্চিত হয়। যোগীদিগের ব্যবহারকালেও নাসিকাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে না—নাভি-পথে ও রোমকূপের পথে চলে। শুধু তাহাই নহে—তাঁহারা তোমাদের ন্যায় পুনঃ-পুনঃ বায়ু গ্রহণ করেন না। বাহ্য বায়ু যখন তাঁহারা গ্রহণ করেন, তখন উহা নাভিপথে নির্ম্মল ভাবেই গৃহীত হয়—মলাংশ বাহিরে পড়িয়া থাকে। ঐ বায়ু দীর্ঘকাল শরীরের ভিতরে ধরা থাকে—ভিতরে ভিতরেই উহা সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই জন্যই যোগিগণ বাহ্যভাবে অভিভূত হন না। চিত্তে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির উদয়, কাম-ক্রোধাদি ভাবের সঞ্চার—সবই বাহ্য-বায়ুর সহিত সংঘর্ষের ফল। যিনি বাহ্য-বায়ুর সহিত সম্বন্ধ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নির্ব্বিকার ভাব ও একাগ্রতা কিছুতেই নষ্ট হয় না—বহির্জগতের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াও তিনি বিষয়ে লিপ্ত হন না। বহিঃস্রোত তাঁহার অন্তরে প্রবেশ-পথ পায় না। যিনি যোগী, তাঁহার দেহ সিদ্ধদেহ। তিনি ইচ্ছামাত্রই নিজের দেহকে সঙ্কুচিত করিতে পারেন, এমন কি পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র করিয়া অদৃশ্য হইতে পারেন—আবার প্রসারণ করিয়া বিরাট্ আকারে পরিণত করিতে পারেন।

ইহাকেই তোমরা অণিমা ও মহিমা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাক। শুধু দেহ কেন, দেহের যে কোন অবয়বকে কিংবা বাহ্য বস্তুকেও তিনি ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ করিতে পারেন। দেহকে ইচ্ছানুরূপ হাল্কা ও ভারী করাও তাঁহার আয়ত্ত। তিনি দেহকে কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় পিণ্ডীভূত করিতে পারেন অথবা সন্ধি-সকলকে শিথিল করিয়া প্রত্যেকটি অংশকে পৃথক্ করিয়া ফেলিতে পারেন। নাভিরন্ধ্র অথবা রোমকূপ দ্বারা বাহিরের যে কোন পদার্থ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে ঢুকাইতে পারেন। সে পদার্থ যত বড় বা যে পরিমাণ হউক, তাহাতে কোন বাধা নাই। তিনি এক দেহকে বহু প্রকারের বা একই প্রকারের বহু দেহে বিভক্ত করিয়া এক বা বহু স্থানে যুগপৎ প্রকাশিত হইতে পারেন। প্রাচীর বা অন্য কোন কঠিন আবরণের ভিতর দিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে যোগি-দেহ প্রতিহত হয় না। তাঁহার দেহে এত অধিক পরিমাণে তাড়িত-শক্তি সঞ্চিত থাকে যে, হিংস্র ভাব লইয়া যে-কোন জীব তাহা স্পর্শ করিতে যাইবে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহা যে তাঁহার ইচ্ছাতে হয়, তাহা নহে—স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। বিষধর সর্পের উগ্র বিষও যোগি-দেহে বিষক্রিয়া করিতে পারে না—দৈহিক তেজের সংঘর্ষে

উহা ভস্ম হইয়া যায় ও দংশনকারী সর্পাদি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। উচ্চ স্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে যোগিদেহ ভূমিস্পর্শ করে না—কারণ দেহে ঊর্দ্ধ-গতিশীল নির্ম্মল বায়ু সঞ্চিত থাকে বলিয়া পড়িবার সময়ে উহা বিক্ষুব্ধ হইবামাত্র দেহ আপনিই শূন্যপথে উপর দিকে উঠিতে থাকে। যোগীর নেত্রে এত তেজঃ-সঞ্চয় হয় যে, তিনি তীব্রভাবে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়—এমন কি, অতি কঠিন প্রস্তর বা লৌহ পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ছোট ছোট বালক-বালিকা—যাহারা অক্ষুণ্ণ-ব্রহ্মচর্য্য-যোগীর নয়নে তাকাইলে নানা প্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পায়। একটু গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে যোগীর দেহ হইতে জ্যোতির ছটা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে—দেহ-প্রভায় অন্ধকার ঘরও আলোকিত হইয়া পড়ে। এইরূপ কত যে লক্ষণ আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যোগী নির্ভীক্, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ ও মধুর-প্রকৃতি হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এ সকল লক্ষণ দ্বারা সাধারণ লোকের পক্ষে মহাপুরুষ চিনিবার সহায়তা হয় বটে। কিন্তু মনে করিও না, ইহা দ্বারাই সকল অবস্থাতে সত্য পরিচয় পাইবে। আর এ সকল লক্ষণ বাহ্যতঃ তুমি দেখিতে

না পাইলেও যে মহাপুরুষত্বের অভাব কল্পনা করিবে, তাহা যেন না হয়।

জি। বাবা, বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে মহাপুরুষের ৩২ লক্ষণ ও ৮৪ অনুব্যঞ্জনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকলও বাহ্য চিহ্ন। তন্ত্রশাস্ত্র ও লক্ষণ-গ্রন্থেও মহাপুরুষের চিহ্নের বিবরণ আছে। কিন্তু আসল কথা, নিজের দৃষ্টিশক্তির বিকাশ অথবা হৃদয়ের সত্য ব্যাকুলতাই মহাপুরুষকে ধরিবার প্রধান উপায়।

যাহা হউক, মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ যে অত্যাবশ্যক বলিয়া আপনি বর্ণনা করিতেছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ইহাই ত গুরুকরণ। গুরুর সাহায্য ভিন্ন কি জীব ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না?

ব। না, জীবে যতক্ষণ গুরুর শক্তি সঞ্চারিত—পতিত না হয়, ততক্ষণ সে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। গুরুদত্ত শক্তিই সাধনার মূলধন।

জি। ইহার কারণ কি? গুরুকরণ না হইলে ধর্ম্মজীবন যাপন করা যায় না কেন? নিজের উন্নতি পরের উপর নির্ভর করিবে—ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা বলিয়া মনে হয়। জগতে কত কত শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়াছেন, তাঁহারা গুরু-বাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারাও ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সকল জীবের

কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না? গুরুর মাধ্যস্থ্য স্বীকার করিতে হইলে নানা প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। পোপের অধীনতায় ক্যাথলিক সমাজের যে দুর্গতি হইয়াছে, আমাদের দেশেও গুরুবাদের প্রভাবে সেই প্রকার, এমন কি, ততোধিক, অপকার হইয়াছে। ইহা আপনাকে মানিতেই হইবে। মানুষ —বিবেকবান্ বিচারশীল মানুষ—অন্য একজন মানুষের অধীন কেন হইবে? এইভাবে আমাদের ব্যক্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ব। বৎস, তোমরা এখনও বালক। তাই সহজেই মাতোয়ারা হইয়া পড়—কোন বিষয় তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা কর না। আমি গুরু বা কৃপা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে তুমি এ প্রকার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইতে না। তোমার সব শঙ্কার সমাধান আমি এক প্রকার করিয়াই দিয়াছি। তবু বিষয়টি জটিল বলিয়া প্রকারান্তরে আবার বলিতেছি। গুরুকরণ ভিন্ন যে ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না, তাহা সত্য কথা। বিশুদ্ধ আধারে প্রকাশমান চিৎ-শক্তির সহকারিতা না পাইলে জড়ত্বের আবরণে আচ্ছন্ন জীব কি প্রকারে আবরণ কাটাইয়া নিজের চৈতন্যময় স্বরূপ উপলব্ধি করিবে? যে শক্তি ঈশ্বরে আছে, তাহাই জীবেও আছে—সত্য;

কিন্তু ঈশ্বরে সে শক্তি প্রকট, কার্য্যকরণ-সমর্থ, অভিব্যক্ত; জীবে তাহা অব্যক্ত, নিষ্ক্রিয়, অপ্রকট, জড়ত্বের ভারে অবসাদগ্রস্ত। জীবশক্তিও যে চিৎশক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা অবিদ্যাগ্রস্ত। উহার বলাধান করিতে হইলে বাহির হইতে উহার সমান বস্তু দ্বারা উহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঐ শক্তিকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলে। উহা বদ্ধজীবে প্রসুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে—উহাকে ক্রিয়া-কৌশলে, গুরু-কৃপায়,যে কোন উপায়ে হউক, জাগাইতে হইবে। তবে ত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইবে। কুণ্ডলিনী নিদ্রিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের বদ্ধতা, নিদ্রাভঙ্গে জীবের মুক্তি। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন নিদ্রিত থাকে, জীবদেহে কুণ্ডলিনী সেইপ্রকার নিদ্রিত থাকে। কাষ্ঠস্থ অগ্নিকে চেতন করিতে হইলে দুই উপায়ে করা সম্ভবপর—

(১) প্রথমতঃ কাষ্ঠের সঙ্গে কাষ্ঠের তীব্র সংঘর্ষ দ্বারা উহার অন্তঃস্থ অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

(২) অথবা, বাহ্য প্রদীপ্ত অগ্নির সঞ্চারে কাষ্ঠস্থ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাষ্ঠে যদি স্বাভাবিক অগ্নি না থাকিত, তাহা হইলে বাহ্য অগ্নি দ্বারা তাহা দগ্ধ হইত না—বাহ্য অগ্নির কোন ক্রিয়াই তাহার উপর হইত না। বাহ্য অগ্নি অভিব্যক্ত, প্রকাশ-কালকে পাইয়াছে—তাহার সংসর্গে কাষ্ঠের অব্যক্ত অগ্নিও

অভিব্যক্ত হয়, প্রকাশ-কালকে প্রাপ্ত হয়। ইহা সঙ্গের মহিমা—সৎ-সঙ্গের ফল। যিনি চেতন, তাঁহার সংস্পর্শে অচেতনও চেতন হইয়া উঠে। অচেতনেও চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আছে—চেতনের সঙ্গবশতঃ উহা প্রকট হয়। যাহাতে প্রসুপ্তভাবে চৈতন্য নাই, তাহা চেতনের স্পর্শেও চেতন হয় না।

চৈতন্যের অভিব্যক্ত রূপকেই গুরু বলে। বিশাল অব্যক্ত চৈতন্য যাহা জীবাধারেও আছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে ঐ অভিব্যক্ত চৈতন্য বা গুরুর দ্বারাই করিতে হয়। একমাত্র গুরুই চেতন করিতে পারেন। সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশ মনুষ্যে—যতই তাহা আবৃত থাকুক। তাই মনুষ্যের সত্ত্বে নিহিত অব্যক্ত-চৈতন্য জাগরণযোগ্য। মনুষ্যেতর জীবে সত্ত্ব মন্দভাবাপন্ন—সেখানে বিচার-শক্তি, বিবেক-শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই—স্থাবরে সত্ত্ব তমোভাবের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, সেখানকার ত কথাই নাই। সুতরাং, গুরুশক্তির সঞ্চার শুধু মনুষ্যদেহেই হয়। তাই মনুষ্য-জন্মের এত প্রশংসা।

জি। কাষ্ঠস্থ অগ্নি যেমন দুই ভাবে চেতন হইতে পারে—জীবের সুপ্তা প্রাণশক্তিও তেমনি দুই ভাবে জাগিতে পারে—বাহ্য-গুরুশক্তির সাহায্যে, অথবা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে। প্রথমটি কৃপা, দ্বিতীয়টি পুরুষকার।

পুরুষকারের পথও ত আছে—সে পথে গুরু না হইলে চলিতে পারে না কি?

ব। দেখ, পুরুষকারের মধ্যেও ঐশীশক্তি রহিয়াছে। গীতায় আছে—"পৌরুষং নৃষু"। পুরুষকারও তাঁহারই বিভূতি। পুরুষকার ও কৃপা অন্যোন্যসাপেক্ষ—একটিকে ছাড়িয়া অপরটি কার্য্যক্ষম হয় না। এ কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবে যাহাকে আমরা কৃপা বলি, তাহাতে কৃপাংশের প্রাধান্য থাকে, পুরুষকারে পুরুষকারের প্রাধান্য থাকে। ইহাই ভেদ। অব্যক্তশক্তির দ্বারা কার্য্যসাধন হয় না—শক্তিকে কার্য্যসাধক করিতে হইলে তাহাকে জাগাইতেই হইবে। চিৎশক্তি প্রবুদ্ধ হইলে তাহাকে ঐশ্বরিক শক্তি বা বিভূতি বলে। চিৎশক্তি প্রসুপ্ত থাকিলে বদ্ধ জীবশক্তি খেলিতে থাকে—ইহা জড়শক্তি; ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন রূপ। জড়শক্তির অন্তরালে চিচ্ছক্তি আছে—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বস্তুতঃ জড়শক্তি চিৎশক্তিরই বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন অবস্থা মাত্র। ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহার ও অন্তঃকরণের নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতার পরমাবস্থায় চিৎশক্তি জাগিয়া উঠে। আবার ঘুমাইয়া পড়ে—ইন্দ্রিয়াদির ব্যুত্থান হয়। ক্ষণমাত্র চৈতন্য প্রকট থাকিলেও তাহার ফলে বাসনা ও সংস্কাররাশি দগ্ধ হয়। পুনঃপুনঃ এইরূপ

হইতে হইতে বাসনাদি ক্ষীণ হইয়া যায়, চিৎশক্তি মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় অনাবৃতপ্রায় ভাবে প্রকাশিত হয়, অবিদ্যা অনেকটা নিবৃত্ত হইয়া যায়। এ যেন উষাকালে অন্ধকারের তিরোভাব। তার পর জ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয়ে সব আবরণ কাটিয়া যায়, লেশও থাকে না। যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান, যাবতীয় ক্রিয়া,—সব পুরুষকার বা কর্ম্ম। কিন্তু কৃপা ভিন্ন শুধু পুরুষকারের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে না। পুরুষকার ততক্ষণ, যতক্ষণ অভিমান থাকে। তারপর যখন কৃপার সঞ্চার হয়, অভিমান বিগলিত হয়, তখন শান্তি আসে। কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অভিমান কাটে না, কর্ম্মনিবৃত্তি হয় না। দৌড়িয়া যেমন নিজের ছায়া লঙ্ঘন করা যায় না, তদ্রূপ শুষ্ক পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম কাটান যায় না। পুরুষকার যেমন প্রবৃত্তি-মার্গের মূল, তেমনি কৃপা নিবৃত্তি-মার্গের মূল। পুরুষ যখন আদ্যা প্রকৃতিকে—স্বভাবকে—আশ্রয় করেন, তখন পুরুষকার কাটিয়া যায়। তখন প্রকৃতিই সব করেন, পুরুষকার বা চেষ্টা আর থাকে না, পুরুষ তখন নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া প্রকৃতির ক্রীড়া দর্শন করেন মাত্র। এই যে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ, ইহাই অভিমান-ত্যাগের ভিত্তি, ইহাই কৃপা-মার্গের সূত্রপাত। আশ্রয় গ্রহণ, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি ভিন্ন কৃপার বিকাশ হয় না। আবার কৃপা

ব্যতিরেকে অভিমান ছাড়িয়া শরণাপন্ন হওয়াও যায় না।

কৃত্রিমতা পরিহার করিয়া স্বাভাবিক পথকে অবলম্বন করিতেই হইবে—স্বাভাবিক পথে পদার্পণ না করিলে স্বভাব বা স্বরূপের উপলব্ধি হইতেই পারে না। কৃত্রিম উপায় ততক্ষণ, যতক্ষণ স্বভাবের আশ্রয় না লওয়া হইয়াছে। ততক্ষণ বিকারের সত্তা অবশ্যম্ভাবী। স্বাভাবিক পথকে অবলম্বন করাই গুরুপদাশ্রয়। নদীর স্রোতঃ সমুদ্রপানে বহিয়া যাইতেছে—তাহাতে নৌকা ভাসাইয়া দিলে স্রোতের টানেই তাহাকে বিনা আয়াসে সমুদ্রে লইয়া যাইবে। তদ্রূপ অন্তঃপ্রবাহশালিনী জাগ্রৎ চিৎ-শক্তির আশ্রয় লইলে তাহাই জীবকে চৈতন্য-সমুদ্রে পৌঁছাইয়া দিবে। অভিমান পূর্ণভাবে গলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তদনুপাতে অঙ্গীভূতরূপে পুরুষকারের আবশ্যকতা আছে। অভিমান ক্ষীণ হইয়া থাকিলে তাহারও ততটা প্রয়োজন হয় না।

সুতরাং পুরুষকারের পথে চলিলেও পরিশেষে প্রকৃতির আশ্রয় লইতেই হয়—কৃপার অপেক্ষা করিতেই হয়। প্রকৃতি রাস্তা না খুলিয়া দিলে জীবের সাধ্য কি অগ্রসর হয়? দ্বার অর্গলবদ্ধ রহিয়াছে— দ্বার মুক্ত করিবেন প্রকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর

(নারায়ণ-নারায়ণী), তাঁহার শক্তিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পুরুষকার দ্বারা দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহাতে দ্বার খোলা যায় না। তবে দ্বারে আসিয়া মাথা নীচু করিবামাত্রই দ্বার খুলিয়া যায়।

পক্ষান্তরে, শুধু কৃপা হইতেও ইষ্ট সিদ্ধি হয় না, যদি তাহার সঙ্গে পুরুষকারের যোগ না থাকে। ঐশ্বরিক শক্তি প্রায় পূর্ণমাত্রায় কৃপারূপে প্রকট হইলেও বদ্ধজীবের শক্তি, পুরুষকার, যদি লেশমাত্র তাহার সহিত যুক্ত না হয়, তবে ফলসিদ্ধি হইবে না। জীবকে অন্ততঃ কৃপা গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে—তাহাও শক্তি বা পৌরুষসাপেক্ষ। যাহাকে আমরা প্রার্থনা বলি, তাহাও পুরুষকার। অন্ততঃ ততটুকু পুরুষকাব, শুভেচ্ছারূপ, জীবের চাই-ই। নতুবা কৃপা নিষ্ফল।

তবে একটি কথা আছে। তীব্র পুরুষকার থাকিলে আবশ্যক কৃপা আপনিই জাগে, আশ্রয়-গ্রহণ আপনিই হইয়া যায়। যে তীব্র পুরুষকারবান্, সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না। ইহা নিশ্চয়। তখন পুরুষকার আপনিই কাটিয়া যায়। আবার তীব্র কৃপা হইলে আবশ্যক পুরুষকার জীবের মধ্যে আপনিই ফুটিয়া উঠে, যাহার দ্বারা সে ঐ কৃপাকে গ্রহণ করিতে পারে। গুরু যদি তেমনভাবে শক্তি প্রকট করেন,

তবে প্রথমতঃ তাহাই জীব-হৃদয়ে শুভেচ্ছারূপে ও অবস্থাবিশেষে কর্ম্মরূপে প্রকটিত হয়। পরে কর্ম্ম বা পুরুষকার নিবৃত্ত হইয়া (ইচ্ছাও নিবৃত্ত হইয়া) শান্তি উৎপন্ন হয়।

যদি কাহারও মনে মুক্তির ইচ্ছা, শুভ ইচ্ছা, ভাল হইবার ইচ্ছা, জাগিয়া থাকে, জানিবে তাহাও ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন। যদি আমার প্রতি তাঁহার কৃপা না হয় তবে তাঁহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা আমাতে হইতে পারে না, আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে না, শুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এ সব তাঁহার দয়ার নিদর্শন। তেমনি যদি দেখিতে পাও কাহারও উপর তাঁহার কৃপা হইয়াছে, তবে নিশ্চয় জানিও, উহার অতি তীব্র পুরুষকার পশ্চাতে রহিয়াছে। কত জন্মের খাটুনি, কত হাহাকার ও ব্যাকুলতা, কত আর্ত্তি ও বেদনা, কত নীরব অশ্রুপাত কাটিয়া গিয়াছে—এখন তাই কৃপার সঞ্চার হইয়াছে। শুধু বর্ষার ধারা দেখিতে পাও—তৎপশ্চাতে নিদাঘের শুষ্ক তাপ কি চোখে পড়ে না ? হঠাৎ কোন জিনিষ হয় না। একজনে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কৃপা পাইল, আর একজন সমস্ত জন্ম খাটিয়াও তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিল না—মনে করিও না, ইহার কোন তাৎপর্য্য নাই। যে অল্প দিনে কৃপা

পাইয়াছে, তাহার অতীত জীবনের ইতিহাস একবার জ্ঞান-দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা কর, তাহার তপস্যার উগ্রতা ও কঠোরতা বুঝিতে পারিবে। যে সমস্ত জীবন খাটিয়াও কৃপা পাইল না, জানিও, তাহাকে এখনও আরও খাটিতে হইবে। ফাঁকি দেওয়ার উপায় নাই। কেহ অল্প বয়সেও বৈরাগ্যবান্ হয়, কেহ বৃদ্ধবয়সেও বিষয়-তৃষ্ণা ছাড়িতে পারে না। জানিও, ঐ বৈরাগী বয়সে বালক হইলেও বস্তুতঃ বৃদ্ধ, কারণ সে প্রবৃত্তি-চক্র ছাড়িয়া নিবৃত্তি-মুখে আসিয়াছে, আর ঐ বিষয়-লোলুপ বৃদ্ধ এখনও বালক, কারণ, এখনও তাঁহার বিষয়-তৃষ্ণা মিটে নাই, এখনও তাঁহার নিবৃত্তি-পথে আসিবার উপযুক্ত ক্লান্তি আসে নাই। ঐ বালক শীঘ্র মুক্ত হইয়া সংসার-মণ্ডলের ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইবে, তাহার গতি নিরুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে, তাহার তৃষ্ণা গতপ্রায় ও বিষয়-সম্বন্ধ শিথিল, কারণ সে প্রকৃতির আশ্রয়ে চলিতেছে। আর ঐ বৃদ্ধ এখনও দীর্ঘকাল সংসারে ভ্রমণ করিবেন। এখনও বহু অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তর্পণ তাঁহার বাকী আছে। অতৃপ্তি ও ঋণ লইয়া কেহ মুক্ত হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ক্লান্ত হইয়া ক্ষণিকের জন্য যখন জীব ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, তখন চমকিয়া বুঝিতে পারিবে, তাহার অন্বেষণের ধন বাহিরে নাই—

অন্তরেই আছে। তখন হইতে তাহার নিবৃত্তির আরম্ভ—অন্তর্মুখে যাত্রার সূচনা।

প্রবৃত্তির অন্ত ও নিবৃত্তির আরম্ভ—এই মধ্য-স্থলেই গুরু প্রকট হন। গুরুশক্তির আবির্ভাব ভিন্ন প্রবৃত্তির অবসান ও নিবৃত্তির প্রারম্ভ হইতে পারে না। অন্তর্জগতে প্রবেশের চাবী গুরুর হাতে—অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট না হইলে নিবৃত্তি-মার্গে চলা সম্ভবপর হয় না, নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার হয় না, স্বাভাবিক কর্ম্ম হয় না।

জি। নিষ্কাম কর্ম্ম কি পুরুষকার নহে ?

ব। দেখ, কর্ম্মমাত্রই পুরুষকার নহে—নিষ্কাম কর্ম্ম পুরুষের কৃতি-সাধ্য নহে বলিয়া উহাকে পুরুষকার বলা উচিত নহে, উহা প্রাকৃতিক কর্ম্ম। পুরুষকারের মূলে অভিমান আছে, নিষ্কাম কর্ম্মের মূলে অভিমান বা কর্তৃত্ববোধ নাই। বস্তুতঃ, গুরুকৃপাতে মধ্যপথ খুলিয়া গেলে স্বভাবের প্রেরণায় যে নিবৃত্ত-কর্ম্ম হয়, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। উহাতে বন্ধন ত হয়-ই না, বন্ধন খসিয়া যায় ও জগতের কল্যাণ হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোদয় অসম্ভব।

ইহারই অপর নাম যোগ। ইহা কর্ম্মের কৌশল। যোগরূপ নিবৃত্ত-কর্ম্ম ভিন্ন যাবতীয় কর্ম্মই কামনাধিকৃত ও বন্ধনের হেতু।

জি। সুতরাং গুরুশক্তির প্রভাবে মধ্যপথ খুলিলে যোগরূপ কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে। এই প্রকার কর্ম্ম ভিন্ন যখন কর্ম্ম কাটাইবার এবং জ্ঞানলাভের অন্য কোন উপায় নাই, তখন আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে গুরুর স্থান অদ্বিতীয়। যে-পথ খুলিলে প্রকৃত কর্ম্ম হইতে পারে, সে-পথ খুলিয়া দেওয়াই যখন গুরুর কার্য্য, তখন গুরুকরণ ভিন্ন কর্ম্মে অধিকার হয় না।

ব। মধ্যপথই ত ব্রহ্ম-পথ। অন্য পথ কুপথ—বিষয়মার্গ। মধ্যপথে শক্তির স্রোত উজানে বহিতে থাকে। যে সকল শক্তি ইন্দ্রিয়াদির পথে এখন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, চিৎশক্তির প্রবোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সব একাগ্র হইয়া, পুঞ্জীভূত হইয়া, চিৎ-প্রবাহের মধ্যে পতিত হইয়া আপনা-হারা হয়। হোমাগ্নি যেমন সমিদাহরণে সমিদ্ধ হয়—বর্দ্ধিত হয়, দেহমধ্যস্থ চিদ্‌বহ্নিও প্রজ্বলিত হইলে ও ইন্দ্রিয়াদির আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত হইলে তেমনি প্রবলাকার ধারণ করে। উহা ঊর্দ্ধস্রোতে চলিতে চলিতে অনন্ত চিৎসাগরে যাইয়া আত্ম-সমর্পণ করে। ইহাই চিন্ময়ী জীবধারার—জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর—চৈতন্য-সমুদ্রে বিলীন হওয়া।

মধ্যপথে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজঃ খেলে—দক্ষিণ ও বামমার্গে বিষয়-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মতেজঃ

ভিতরের দিকে চলে, বিষয়-স্রোতঃ বাহিরের দিকে চলে ; একটি ঊর্দ্ধাকর্ষণ, অপরটি মাধ্যাকর্ষণ বা অধঃ-কর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট নীচ-ভাবাপন্ন জীবকে এই ঊর্দ্ধ স্রোতে যুক্ত করিয়া দেওয়াই গুরুর কার্য্য। স্রোতের কার্য্য স্রোতঃই করিবে—তাহা স্বাভাবিক। গুরু শুধু স্বভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া দেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গুরু-তত্ত্ব

জিজ্ঞাসু। এতক্ষণ যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে মনে হইতেছে যে, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ বা গুরুকরণ ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে আপনার সকল উপদেশই আমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছি। অনেক বিষয়ে আমার সংশয় দূর হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য বাকী রহিয়াছে। গুরুকরণের আবশ্যকতা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গুরুর স্বরূপ কি, তাহা জানা আবশ্যক। গুরু-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে আনুষঙ্গিক সকল শঙ্কাই সহজে মীমাংসিত হইয়া যায়।

বক্তা। বৎস, আমি এতক্ষণ তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে এবং বুঝিবার চেষ্টা করিলে গুরু-তত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্ত নিজেই বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক, বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বোধগম্য করিবার জন্য আমি আরও কিছু বলিতেছি। শাস্ত্র বলেন—"গু" অন্ধকার এবং "রু" আলোকের বাচক। যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান, অথবা

যিনি অন্ধকার-রাজ্যে আলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া আসেন, তিনি গুরু। যিনি এই সংসারারণ্যের পথ প্রদর্শক, দুস্তর ভব-সমুদ্রের কর্ণধার, তিনি গুরু। অসত্য, অজ্ঞান ও মৃত্যুরাজ্য হইতে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় নিত্যধামে প্রবেশ করা একমাত্র তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করে।

গৃণীতে তত্ত্বমাত্মীয়মাত্মীকৃতজগত্রয়ম্।
উপায়োপেয়রূপায় শিবায় গুরবে নমঃ॥

যিনি জ্ঞানের আলোক দ্বারা তত্ত্ব-বস্তু দেখাইয়া দেন—আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করেন—যিনি অন্ধকে দৃষ্টি-শক্তি দান করিয়া অনন্ত মহাশক্তির বিরাট্ বিশ্বলীলা দেখাইতে দেখাইতে আত্মস্বরূপ দর্শনে স্থিতি লাভ করিবার যোগ্যতা দান করেন, তিনিই গুরু। জীবের যাহা স্বভাব তাহাই তাহার প্রিয়তম। স্বভাবে থাকা, স্বাভাবিক পথে চলা—ইহা হইতেই আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। জীব স্বভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন ও কখন পড়িয়াছে, সে বিচার এখানে তুলিবার প্রয়োজন নাই। স্বভাবচ্যুত হইয়া সে বিকারগ্রস্ত হইয়াছে—তাই আজ সে আনন্দের অন্বেষণে চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু অন্বেষণ করিয়াও প্রকৃত আনন্দের সন্ধান সে

পাইতেছে না। যদি পাইত তাহা হইলে তাহাকে আর অন্বেষণ করিতে হইত না, সে চিরদিনের জন্য তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এমন হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, জীব স্বভাবচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ যখন হইতে বর্ত্তমান জীবভাবের উন্মেষ হইয়াছে, তখন হইতেই সে নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। তাই সে কোন জিনিষেরই প্রকৃত রূপ চিনিতে পারে না। প্রতিপদে ভুল করিয়া বসে—এককে আর মনে করে। কিন্তু জলের তৃষ্ণা দুধে মিটিবার নহে। সে দুধ দেখিয়া মনে করে, ইহাতেই তাহার তৃষ্ণা শান্ত হইবে, কিন্তু ইহা যে তৃষ্ণার উপশমকারক সুশীতল জল নহে, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সে ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া জল-বোধে দুধই গ্রহণ করিতে যায়। কিন্তু পরে বুঝিতে পারে, তাহা হইতে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না। তখন আবার অন্য জিনিষে ঐ প্রকার জল-ভ্রম উৎপন্ন হয়—সে দুধ ছাড়িয়া উহাই গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু ইহারও পরিণাম পূর্ব্বের ন্যায় নৈরাশ্যজনক। ভাগ্যহীন জীব জীবনভোর তৃষ্ণা-কাতরই থাকিয়া যায়, তাহার শান্তি-সলিল কোথাও জোটে না। ভাবিয়া দেখ, সকলেরই এই অবস্থা। কিন্তু এমনটা কেন হয়? ভুল ভাঙ্গে না কেন?

ভুলের মূল অবিদ্যা রহিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ অবিদ্যা ছিন্ন না হইবে, ততক্ষণ ভুল ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই, নিত্যই নূতন নূতন ভ্রমের উন্মেষ হইতে থাকিবে। ইহা স্থির সত্য, জানিও। তুমি নিজেকে যতই চতুর মনে কর না কেন, বিশ্ব-চতুরের চাতুরীকে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিবে না। তোমার যাবতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সেই মহামায়াবীর বিরাট্ ইন্দ্রজালের অন্তর্গত, জানিও।

জীব যখন স্বভাব হইতে পতিত হইয়াছে, তখনই এই ঘোররূপা অবিদ্যা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। অজ্ঞানের প্রভাবে জীব এখন সুপ্তপ্রায়,—আত্মবিস্মৃত। আবার তাহাকে ফিরিয়া নিজের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে—তবে ত সে সুস্থ হইবে। কিন্তু সে ফিরিবে কি প্রকারে? রাজপুত্র আজ কাঙ্গাল হইয়া কাঙ্গালের বেশে দীনভাবে হাহাকার করিতেছে—কে তাহাকে আত্মপরিচয় দান করিয়া তাহার শোকাপনোদন করিবে? সেই জন্যই এমন একজন দয়ালু, শক্তিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের আবশ্যকতা হয়, যিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতে পারেন, তাহাকে আপন স্বভাবে ফিরাইয়া লইতে সাহায্য করিতে পারেন। যিনি নিজে জাগিয়াছেন, তিনিই নিদ্রিতকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন—নিদ্রিত নিদ্রিতকে জাগাইতে পারে

না। যিনি জ্ঞানী, সদা-জাগ্রৎ, বিভূতিসম্পন্ন ও দয়াময়, তিনিই জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জীবের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়া তাহার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলন করিয়া দিতে পারেন। অজ্ঞানী তাহা পারে না। সুতরাং, বস্তুতঃ স্বয়ং পরমেশ্বরই গুরু। তাঁহারই কৃপায় জীব তাঁহাকে চিনিতে পারে।

জি। আপনি বলিতেছেন—পরমেশ্বরই গুরু। এ কথার তাৎপর্য্য কি? প্রচলিত ব্যবহারে ত 'গুরু' শব্দে মানুষই বুঝাইয়া থাকে।

ব। 'ঈশ্বরই গুরু' এ কথার অর্থ এই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, পাইতে পারে না। তিনি স্বয়ং গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে জীব অনন্তকাল খুঁজিয়াও তাঁহাকে ধরিবার পথ আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

তিনি শুদ্ধচৈতন্যময়—তাঁহার স্বরূপ এক-রস। তাই তিনি অদ্বিতীয় বস্তু, একেলা, অসঙ্গ। দ্বিতীয় কোন বস্তু, কোন ভাব, কোন শক্তি সেখানে থাকিতে পারে না, যাইতেও পারে না। কে জীবকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবে?

তাঁহার স্বরূপ-ভূতা কৃপাশক্তি, তাঁহার ইচ্ছায় নামিয়া আসে। আসিয়া জীবকে ক্রমশঃ তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া লয়, পরে জীবকে শোধিত করিয়া

স্বরূপে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। যে স্বচ্ছ আধার অবলম্বনে এই কৃপাশক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকেই গুরু বলে। সুতরাং একমাত্র পরমেশ্বরই গুরু—নির্ম্মল চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মনুষ্যাদি কেহই গুরু হইতে পারে না।

জি। আপনি বলিতেছেন যে, ভগবান্ই একমাত্র গুরু। তিনি জ্ঞানশক্তি দ্বারা জীবকে উদ্ধার করেন। জীব তাঁহার কৃপাতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞানের আলোকে সত্যবস্তু যথার্থভাবে দেখিতে পায়।

ব। হাঁ, তাই বটে। শুধু যে দেখিতে পায়, তাহা নয়। দেখিয়া চিনিতে পারে—আপন বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের অবসানে চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ বস্তুর প্রাপ্তি হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। যে বুঝাইতে চেষ্টা করে সে তাহা জানে না, যে জানে সে ঐ প্রকার বৃথা চেষ্টা করে না। তাহা "মূকাস্বাদনবৎ," বোবার রসোপলব্ধির অনুরূপ, অর্থাৎ অবর্ণনীয়।

জি। বেশ কথা। কিন্তু আপনি বলিলেন যে, ভগবান্ই গুরু, এতৎসম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ভগবান্ই

গুরু' এই কথা সত্য, না 'গুরুই ভগবান্' এই কথা অধিকতর সত্য? এই দুইটি কথার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম ভেদ আছে—তাহাই মনে করিয়া আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ব। তুমি এখনও গুরু-তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পার নাই। 'গুরু ভগবান্' একথার কোন অর্থই বুদ্ধিগোচর হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুশব্দের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হয়। গুরু বলিতে যদি শুদ্ধ-চৈতন্যময় বস্তুটি বুঝ, আর 'ভগবান্' শব্দটিও যদি সেই বস্তুরই বাচক বলিয়া বুঝিতে পার, তাহা হইলে ত কোন প্রশ্নেরই অবকাশ থাকে না। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পার না। ভগবান্ অনন্ত শক্তিময়—তাঁহার অনন্ত রূপ। তন্মধ্যে তাঁহার অনুগ্রহ শক্তির রূপকেই 'গুরু' বলে। সম্প্রতি ইহাই বুঝিয়া রাখ। অনন্ত চৈতন্যশক্তিকে তাঁহার অনুগ্রহের দিক্‌টা লক্ষ্য করিয়া গুরু বলা হয়। দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দের বিকাশই অনুগ্রহের স্বরূপ।

যাহা হউক, এ সব বাক্য-বিন্যাসের ভেদ-বিলাস মাত্র। তোমার প্রকৃত সংশয় কি, তাহাই আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

জি। আমার জিজ্ঞাস্য এই—ভগবানের যখন অনন্তরূপ, তখন জীব ও জড়—স্থাবর ও জঙ্গম, সকল পদার্থই তাঁহার

রূপ। যদি তাহাই হয়, আর গুরুও যদি তদ্বৎ ভগবানের রূপই হন, তাহা হইলে উভয়ে পার্থক্য কোথায় থাকিল এবং গুরুর প্রাধান্যই বা কোথায় থাকিল?

ব। ভগবান্ যে বিশ্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং যে কোন রূপ প্রতীতি-গোচর হয়, তাহাও তাঁহারই রূপ। তথাপি গুরু ও অন্যান্য রূপে অনেক ভেদ আছে। অবশ্য, বাস্তবিক ভেদ কোথাও নাই। অজ্ঞান শক্তির সত্তা-গত অনন্ত ভেদ অনুসারে জগতে অনন্ত জীবভেদ আবির্ভূত হইয়াছে। জ্ঞানশক্তি শুদ্ধরূপে চৈতন্যরূপা ও অদ্বিতীয়া—তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, উপাধির সংমিশ্রণ নাই, গুণবিকার নাই। অন্ধকার হইতে যেমন আলোক প্রধান, সেই প্রকার অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বভাবতঃ প্রবল। তাই অজ্ঞান শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন হইলেও এবং অনাদি কালের সঙ্ঘাতবশতঃ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, জ্ঞানের নিকটে হীনপ্রভ। জ্ঞানের প্রাধান্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক হইলেও গুরুরূপে তাঁহার যে নির্গুণ প্রকাশ, তাহা গুণাধিকার-স্থিত অজ্ঞান-বিকার-মূলক কোটী কোটী খণ্ড প্রকাশ অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ।

এই জন্য ভেদ-দৃষ্টিতে দেবতা অপেক্ষাও গুরুর স্থান উচ্চে। "শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে

ন কশ্চন।" মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা অন্যান্য জীব-জন্তুর কথা ত আলোচ্যই নহে। গুরুর উপরে কোন তত্ত্ব নাই। গুরু তত্ত্বাতীত তত্ত্ব।

জি। আপনার কথাতে আমার অনেক সংশয় দূর হইল। কিন্তু আপনি এ একটা সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র। ব্যবহার-জগতে এ সিদ্ধান্তের কোনই উপযোগিতা নাই।

ব। কেন নাই? তোমার কি মনে হয়?

জি। পরমেশ্বর গুরু হইতে পারেন—কিন্তু জীবের তাহাতে কি লাভ? জীব ত আর তাঁহাকে পাইতে পারে না। তিনি যাহাই হউন, আপনি তাঁহাকে যতই দয়ালু বা শক্তিধর বলিয়া মনে করুন, জীবের পক্ষে তিনি দুরধিগম্য।

আপনি বলিতেছেন পরমেশ্বরই উপায়, আবার তিনিই উপেয়। অর্থাৎ-তাঁহার সাহায্যেই তাঁহার কাছে যাওয়া যায়। তাঁহাকে ধরিতে পারিলে তবে ত তিনি গম্যস্থানে অর্থাৎ স্বভাবে পৌঁছাইয়া দিবেন। বদ্ধ জীব কি-প্রকারে সেই নির্ম্মল বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

ব। সেই জন্যই ত তিনি নামিয়া আসেন। তিনি নামিয়া আসিয়া জীবের কাছে ধরা দেন, জীবকে আকর্ষণ করেন, তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। তিনি যদি

না নামিতেন, তাহা হইলে জীব কদাপি তাঁহাকে পাইত না, আত্মোদ্ধারের পথ চিনিতে পারিত না। তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়। এই কৃপাই গুরুর শক্তি।

জি। তবে কি গুরু ও অবতার সমান? উভয়ের মধ্যে কি কোন ভেদ-নির্দ্দেশ করা চলে না?

ব। এক হিসাবে ছুই-ই সমান বটে। তবে একটু কথা আছে। সাধারণতঃ অবতার বলিতে যাহা বুঝায়, গুরু-তত্ত্ব তাহা হইতে একপ্রকারে পৃথক্ হইলেও প্রকারান্তরে অভিন্ন। শুদ্ধ স্বরূপ হইতে শক্তি-প্রবাহক্রমে প্রপঞ্চে নামিয়া আসাই অবতারবাদের মূল কথা। জ্ঞান-শক্তির ধারা নামিয়া আসিলেই সাধারণতঃ 'গুরু' শব্দের প্রয়োগ হয়। অবান্তর শক্তির প্রবাহ অবতীর্ণ হইলে 'অবতার' শব্দের ব্যবহার হয়। জগতের আপেক্ষিক সাম্য সংরক্ষণই অবতারের উদ্দেশ্য। ইহা সাময়িক ব্যাপার। ইহাকেই ধর্ম্মসংস্থাপন বলে। ধর্ম্ম জগতের রক্ষক, যখন প্রতিকূল শক্তির আক্রমণে ধর্ম্ম আচ্ছন্ন হয়, তখন স্বভাবের প্রেরণাতে মহাশক্তি হইতে তাঁহার অংশ বাহির হইয়া আসিয়া গ্লানিপ্রাপ্ত ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করে ও পুনঃস্থাপিত করে, জগতের ঘোরতর বিপ্লব দূরীভূত করে। ইহাই মোটামুটি অবতারবাদ। গুণাবতার, লীলাবতার,

যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি অনেক প্রকার অবতার আছেন। সে-সব কথা এখানে আলোচ্য নহে। জীবকে স্বভাবে লইয়া যাওয়া অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—অবশ্য গৌণভাবে তাহাও সত্য। কিন্তু গুরুর মুখ্য কার্য্যই পতিত জীবকে উঠাইয়া লওয়া—ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া। জ্ঞান দান করাই গুরুর কার্য্য, তাহাতেই তাঁহার সার্থকতা। প্রধান ও প্রাসঙ্গিক ভাবে সাধারণতঃ অবতারের কার্য্য উহা নহে। তবে অবতারও প্রয়োজন হইলে গুরু-ভাব গ্রহণ করিতে পারেন এবং গুরুরূপে আসিয়াও ইচ্ছা হইলে অবতারের কার্য্য, অর্থাৎ ধর্ম্মসংস্থাপন, ন্যূনাধিক পরিমাণে করিতে পারেন। দুই-ই পরমেশ্বরের লীলা। সুতরাং ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

আর এক কথা। অবতার যে শুধু ভগবানেরই হয়, তাহা নহে। তাঁহার ভক্তগণেরও হইতে পারে—নিত্য-মুক্ত ও সিদ্ধ জীবগণের হইতে পারে। তাঁহার শক্তি অনন্ত—যে-কোন শক্তির অবতার হইতে পারে। এমন কি বৃত্তি নামে পরিচিত কাম, ক্রোধাদি শক্তিরও অবতার হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু একমাত্র সাক্ষাৎ ভগবান্ ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

জি। যখন ভগবান্‌ই গুরু, তখন তিনিই বিশ্বজগতের একমাত্র গুরু। সুতরাং গুরু ত অনেক হইতে পারে না। তবে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নাম শাস্ত্রে পাই এবং ব্যবহার-ভূমিতেও গুরুর ভেদ স্বীকার করিয়া থাকি, তাহার হেতু কি?

ব। ভগবান্‌ই যে সকলের গুরু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গুরু-তত্ত্ব এক ভিন্ন অধিক হইতে পারে না। শুধু গুরু-তত্ত্ব কেন, কোন তত্ত্বই বহুসংখ্যক হইতে পারে না। তুমি কি মনে কর, জগতে বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মাতা বা দুইটি পিতা আছে? পিতা এক ভিন্ন দুই নাই, মাতাও তাই, সখা ও প্রিয়জনও তাই। কিন্তু ইহা শুদ্ধ তত্ত্ব-বস্তু—ইহার আস্বাদন নাই। আস্বাদন বা আত্মপ্রকাশ মূর্ত্তি অথবা রূপ ব্যতিরেকে হয় না। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে, বিভিন্ন আধারে, একই তত্ত্ব বিভিন্ন দ্রষ্টার ভেদ-রঞ্জিত দৃষ্টির সম্মুখে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে বস্তু-সত্তার ভেদ হয় না। একই নির্ব্বিশেষ শুক্লবর্ণ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীল রক্তাদি নানাপ্রকার বিশিষ্ট বর্ণে প্রকাশিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। সৌন্দর্য্য যেমন এক ও অখণ্ড, অথচ আমাদের বাসনাভেদে অনুরঞ্জিত নয়নের সম্মুখে উহা মূর্ত্ত হইয়া খণ্ড রূপের মধ্যে অনন্ত প্রকার

বৈচিত্র্য সহকারে প্রকাশ পায়, গুরুও তেমনই এক ও অদ্বিতীয়। তবে নামরূপের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেদ-রাজ্যে তিনি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যে ভিন্ন ভিন্ন গুরুর কথা জানিতে পার, ইহাই তাহার কারণ। রস-তত্ত্ব এক হইলেও যেমন খণ্ড রস বহুসংখ্যক, এমন কি বস্তুতঃ অনন্তও বলা যাইতে পারে, সেই প্রকার গুরু-তত্ত্ব এক হইলেও তাঁহার আবির্ভাব বহু হইতে পারে।

জি। আপনি বলিতেছেন, গুরু-তত্ত্ব এক, কিন্তু তাঁহার বাহ্যপ্রকাশ বহু। অবশ্য ইহা উপাধির বহুত্ব-নিবন্ধন। এখানে একটি বিষয়ের জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। এক ব্যতিরেকে কখনও বহুভাবের অভিব্যক্তি মানিতে পারা যায় না। উপাধির বহুত্বও উপাধির ঐক্যমূলক। অর্থাৎ একটি ব্যাপক উপাধিই খণ্ডিত বা খণ্ডিতবৎ হইয়া বহু উপাধির সূচনা করে। মূলেই যদি উপাধি না থাকে, তাহা হইলে বহু উপাধি আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং বহুভাগের পূর্ব্বে উপাধির সত্তা-স্বীকার যুক্তিসিদ্ধ। এই যে আদিম উপাধির কথা বলা হইল, ইহাকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব-বস্তু রূপ-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ইহা যাবতীয় রূপের সমাহার স্বরূপ পরম-রূপ। ইহাই তত্ত্বাতীত সত্তার প্রথম আবির্ভাব—ইহা এক

ও অদ্বিতীয়। বিম্বভিন্ন প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।

ব। হাঁ, তুমি সত্যই বলিয়াছ। এক হইতেই বহুর উদয় হয়, পুনরায় বহু একের মধ্যেই বিশ্রাম লাভ করে। যাহা অরূপ, তাহা সহসা বহু-রূপে পরিণত হয় না। সর্ব্বাগ্রে তাহা একমাত্র রূপ-সামান্যে প্রকাশমান হয়—অবশ্য ইহাও ব্যাপক উপাধির সম্বন্ধ-নিবন্ধন। পরে সেই এক রূপ কালপ্রভাবে বহু রূপে পরিণত হয়। জগতের যাবতীয় বিশিষ্ট রূপ সেই একমাত্র মূল রূপের বিকৃত ছবি। এই যে মূল রূপের কথা বলিলাম, ইহা ভগবানের নিত্য-রূপ। পাঞ্চরাত্রগণ ইহাকে 'নিত্যোদিত' রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর নিকট ইহা 'শান্তোদিত'-ভাবে প্রকটিত হয়। সুতরাং ভগবান্ যে একই কালে অরূপ ও রূপবান্, নিরাকার ও সাকার, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্য, এই রূপের কথা শুনিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক রূপের কথা যেন তুমি মনে করিও না। সাধারণতঃ যোগী বা ভক্তগণও তাঁহার এই পরম-রূপের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে ভগবানের যে-রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরম-রূপ বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার ভ্রান্তি

অপনোদন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বহু কথা বলিবার আছে—তাহা সময়ান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ ইহা স্মরণ রাখ যে, গুরু-তত্ত্বও ঐ প্রকার প্রথমে এক মূলরূপে প্রকাশমান হইয়া পরে দেশ ও কালের ক্রম-বৈচিত্র্যবশতঃ উপাধির বিভাগ অবলম্বনে নানা প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

জি। গুরুর সেই নিত্যরূপ কি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না? যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে গুরুর দর্শন পান, তাঁহারাও কি সেই মূলরূপ দর্শন করিতে পারেন না?

ব। গুরুর সেই নিত্যরূপ সাধারণতঃ লোকে দেখিতে পায় না। যাহা সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সেই পরমরূপ নহে। সংস্কার-রঞ্জিত নেত্রে সকলেই আপন আপন বাসনানুরূপ গুরু দর্শন করিয়া থাকেন। একই গুরু-রূপ অনাদিকাল হইতে সময় অনুসারে সকলের নিকট প্রকাশিত হইতেছে। গুরু অভিন্ন হইলেও সকলে আপন আপন ভাবময় রূপেই তাঁহার দর্শন পাইতেছে—তাঁহার স্বরূপের দর্শন কেহই পাইতেছে না। তবে যিনি ভাবের অঞ্জন মুছিয়া ফেলিয়া গুরুর রূপ দেখিতে পান, তিনি নিশ্চয়ই গুরুর ভাবাতীত ও মহাভাবময় নিত্যরূপই প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু শব্দকোষে এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়,

জগতের মধ্যে প্রকাশিত অনন্তরূপের মধ্যে ঐ একমাত্র রূপই প্রকাশ পাইতেছে। সে প্রকাশের আবরণ নাই অথচ দ্রষ্টার নয়ন আচ্ছন্ন বলিয়া সেই মুক্তরূপও কেহ দেখিতে পায় না। তাই প্রত্যক্ষ বস্তুর উপরেও—যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একমাত্র অপরোক্ষ বস্তু—তাহার সম্বন্ধেও জগতে সংশয় ও ভ্রান্তির অবসান ঘটে না।

জি। বৌদ্ধগণ, জৈনগণ, খ্রীষ্টানগণ, মুসলমানগণ সকলেরই তাহা হইলে সেই একমাত্র গুরু। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তাই।

ব। নিশ্চয়ই তাই। শুধু তাহা কেন? ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও যিনি গুরু, কপিল ব্যাস অগস্ত্য বামদেব শুকদেব প্রভৃতিরও যিনি গুরু, তোমার-আমার গুরুও তিনিই। ধর্ম্মমাত্রেরই প্রবর্ত্তক তিনি—প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম তাঁহা হইতেই বাহির হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, যাবতীয় বিদ্যা, কলা, শিল্প—সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। জ্ঞান যেমন নানাপ্রকার হইলেও এক, সেই প্রকার জ্ঞানের আধারও মূলতঃ এক।

জি। তাহা হইলে পরমেশ্বরই আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানাদি বিদ্যা প্রবর্ত্তন করেন? কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? ইহার অন্যথা কি কোথাও দেখা যায় না?

ব। বস্তুতঃ ইহার অন্যথা কোথাও হয় না। জ্ঞানের আদি-

প্রবৃত্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে —কারণ, তিনি আদি-গুরু। তবে যে মহাপুরুষ আপন স্বচ্ছ আধারে তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া লন, তিনি অবশ্য জগতে তাহা সঞ্চার করিতে পারেন। কেহ কেহ তাঁহাকে জ্ঞানদাতা মনে করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ত স্বভাবসিদ্ধ নহে।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কপিল ও আসুরির কথা বলা যাইতে পারে। কপিলকে আদি-বিদ্বান্ বলা হইয়া থাকে —তাহা তুমি জান। তিনি একজন সিদ্ধ ছিলেন— পূর্ব্বকল্পে সাধনা সমাপ্ত করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৈবল্য তখনও তাঁহার আয়ত্ত হয় নাই। এদিকে প্রলয়কালে জগৎ অব্যাকৃত রূপ ধারণ করিল। প্রলয়ান্তে প্রকৃতির নবীন উন্মেষের সময় তিনিও জ্ঞানময়রূপে সৃষ্টির আদিতে প্রকটিত হইলেন। তাই তাঁহাকে আদি-বিদ্বান্ বলে। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে যাঁহারা যাঁহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সকলেই কপিলের কনিষ্ঠ। কপিল আবির্ভূত হইয়া, অর্থাৎ নির্ম্মাণকায় ধারণ করিয়া, জিজ্ঞাসু আসুরির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। এই জ্ঞান-শাস্ত্র সাংখ্যজ্ঞান নামে পরিচিত। কিন্তু মনে রাখিবে, কপিল বর্ত্তমান সৃষ্টির আদি-বিদ্বান্ হইলেও, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবান্ নহেন। সে শুধু

একমাত্র পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু।

জি। 'নির্ম্মাণকায়' কি? নির্ম্মাণকায় গ্রহণ না করিয়া কি তিনি জ্ঞান দিতে পারিতেন না?

ব। নির্ম্মাণকায়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্য সময়ে বলিব—এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে সংক্ষেপে দুই একটি কথা মাত্র এখানে বলিতেছি।

জ্ঞান দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে—এক, শব্দ আশ্রয় করিয়া, দ্বিতীয়, শব্দরহিত ভাবে। প্রথম জ্ঞানকে শাব্দজ্ঞান বলে। যোগ শাস্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে প্রাতিভ জ্ঞান বলে। ইহা অনৌপদেশিক জ্ঞান। উপদেশ মাত্রই প্রথম প্রকার জ্ঞানের হেতু, কিন্তু প্রাতিভ জ্ঞান উপদেশ-নিরপেক্ষ। কিন্তু উপদেশের আবশ্যকতা না থাকিলেও গুরু ভিন্ন কোন জ্ঞানেরই উদয় হইতে পারে না। সাধারণতঃ গুরু প্রথমতঃ ঔপদেশিক জ্ঞান দান করেন—কিন্তু শিষ্যের যোগ্যতা অধিক হইলে, যখন শিষ্য বিকল্পময় শব্দরাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠে, তখন গুরু হইতেই অনৌপদেশিক জ্ঞানের উদয় হয়।

ঔপদেশিক জ্ঞানদানের জন্য দেহ আবশ্যক হয়। যোগিগণ বিদেহ হইলেও শুদ্ধ উপাদান গ্রহণ পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে

অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রয়োজনানুসারে জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন। এই দেহকে নির্ম্মাণকায় বলে, নির্ম্মাণ-চিত্তও বলে। এই অবস্থায় দেহ ও চিত্ত অভিন্ন বলিয়া বস্তুতঃ নির্ম্মাণকায় ও নির্ম্মাণচিত্তে মূলে কোন পার্থক্য নাই। নির্ম্মাণকায় নানা উপায়ে নির্ম্মিত হইতে পারে। তবে যোগিগণের ধ্যানজাত নির্ম্মাণকায়ে কর্ম্মাশয় থাকে না—অন্যান্য কায়ে কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়। তত্ত্ব উপদেশ করিবার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ আধার।

ঋষি-মহর্ষিগণ, সিদ্ধমণ্ডলী—ইহাঁরাও নির্ম্মাণকায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন। পাঞ্চভৌতিক দেহে ঠিক ঠিক তত্ত্বোপদেশ হয় না—নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে। তাই নির্ম্মাণকায়ের আবশ্যকতা হয়। যাঁহারা যোগী, তাঁহারা জীবদ্দশাতেও অনেক সময়ে বিশুদ্ধ অস্মিতা হইতে নির্ম্মাণকায় আকর্ষণ করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন।

কখনও কখনও অবশ্য দেহের প্রকাশ মোটেই হয় না—অথচ আকাশবাণীরূপে উপদেশ শ্রুত হয়। বহু স্থলে শ্রুতির উৎপত্তি-প্রকার ইহাই।

জি। আত্মস্বরূপোপলব্ধি ও দুঃখনিবৃত্তি যে জ্ঞান হইতে হয়, তাহা কি শাব্দজ্ঞান, অথবা প্রাতিভজ্ঞান ?

ব। যোগিগণ জানেন যে, তারক-জ্ঞান বা বিবেকজ-জ্ঞান

হইতেই সংসার নিবৃত্ত হয়, সংশয় ছিন্ন হয়। এই জ্ঞান উপদেশ দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রবৃত্ত হয় না। সেই জন্য ইহাকে অনৌপদেশিক জ্ঞানও বলে—ইহা জীবের হৃদয় হইতে প্রতিভানরূপে স্বভাবতঃই উত্থিত হয়। ইহা অপরোক্ষ অনুভূতি—ইহার কোন উপদেষ্টা নাই। তবে যাঁহারা আগমবিৎ ও শব্দের মূলরহস্যজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, ইহাও শব্দানুবিদ্ধ। তাঁহারা শব্দের যে সূক্ষ্ম স্তর দেখিতে পান, সেখানে জ্ঞান-মাত্রই শব্দানুবিদ্ধ জানিতে পারা যায়।

প্রাতিভ জ্ঞানে ক্রম থাকে না। ইহার দ্বারাই জীব সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে। শাক্যমুনি বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই প্রাতিভ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ইহার নামান্তর দিব্যচক্ষুঃ। ইহার দ্বারা তিনি—"দদর্শ নিখিলং লোকমাদর্শ ইব নির্ম্মলে।" এই বিশ্ব-দর্পণ-দৃশ্যমান নগরী-তুল্য—সমগ্র বিশ্ব তিনি দিব্যচক্ষু দ্বারা যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যে ভগবদ্দত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা এক স্থানে অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন সমগ্র জগৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই বিশ্বরূপ দর্শনও প্রাতিভ জ্ঞানেরই একটা বাহ্য অবস্থা মাত্র।

আত্মদর্শনের পূর্ব্বে এইরূপ জগদ্দর্শনও হইয়া থাকে। যিনি এই চক্ষুঃ দান করেন, তাঁহাকে গুরু বলে।

শব্দজ্ঞান ও প্রাতিভজ্ঞান, উভয় জ্ঞানই গুরু হইতেই হয়। প্রতিভার পরে যে আত্মদর্শন হয় তাহাও গুরু হইতেই হয়। স্বভাবই গুরু, পরমেশ্বরই গুরু—তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন জ্ঞানেরই উদয় হয় না।

মনে রাখিও, গুরুর শ্রেষ্ঠ রূপ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত অনন্ত স্বরূপ হইতে যে জ্ঞান-প্রাপ্তি হয়, তাহাই জ্ঞানের বিশুদ্ধতম রূপ। তাঁহার স্বপ্রকাশময়, অখণ্ড ও শুদ্ধ ব্যক্ত-রূপ—যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বাধারে প্রকাশমান—তাহা হইতে যে জ্ঞান উদিত হয়, তাহাও অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান। তবে জীব যতক্ষণ ভাবাতীত না হইতে পারে, ততক্ষণ এই দ্বিবিধ জ্ঞানের স্ফুরণ তাহাতে হয় না। তখন ভগবানেরই কোন বিশিষ্টরূপ অবলম্বনে অথবা কোন দিব্যবাণীরূপে অথবা ভাবরূপে অন্তরাত্মায় যে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তাহা তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান। ইহাও সাধারণ লোকের ভাগ্যে প্রথমে ঘটে না। যখন স্থূল দেহে ভগবৎসত্তার আবেশ হয়—যখন কোন স্থূলাভিমানী জীবকে, সাধন-শুদ্ধ জীবকে, আশ্রয় করিয়া ঐ উপাধির সামর্থ্যানুসারে ভগবৎশক্তির প্রকাশ হয়, তখন ঐ জীব হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই চতুর্থ জ্ঞান। ইহাই প্রথমাবস্থায় মনুষ্যলোকে সম্ভবপর। তবে এ অবস্থার

জীবও—ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট জীবও—এ সংসারে অতি বিরল। সাধারণতঃ ইঁহারাই গুরুপদবাচ্য। কিন্তু মনে রাখিও, মনুষ্যরূপে উপদেশ দান করিলেও প্রকৃত উপদেষ্টা জীব নহে, তাহার অন্তঃস্থ পরমাত্মা। জীব কখনও জীবের উপদেষ্টা হইতে পারে না।

জি। উপনিষৎ বলিয়াছেন—প্রত্যেক দেহেই দুইটি আত্মা আছেন—একটি ভোক্তা জীব, অপরটি ভোগনির্মুক্ত শুদ্ধ দ্রষ্টা বা সাক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা। অন্তরাত্মরূপে প্রতি আধারেই জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য সখা পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন।

যখন সর্ব্বত্রই পরমাত্মা আছেন, তখন নিজের মধ্যে তাঁহাকে অন্বেষণ না করিয়া অন্যের কাছে যাইবার প্রয়োজন কি? তিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে রহিয়াছেন—কোথাও তাঁহার ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। সুতরাং "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।"

ব। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য। কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক হইলেও তাঁহার প্রকাশমানতা, অভিব্যক্তি, সর্ব্বত্র সমান নহে। শুধু সত্তা হইতে ইষ্টসিদ্ধি হয় না। সৎ হইয়াও যদি অব্যক্ত হয়, তবে তাহার দ্বারা কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এই প্রকার নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সংকে লৌকিক মানদণ্ডে

অসৎ বলিলেও ক্ষতি হয় না। অতএব, সৎকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে, তবে তাহার দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে পারিবে। আগুন না আছে এমন কোন স্থান নাই, প্রসুপ্তরূপে অগ্নি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে। এ কথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু সে অগ্নি হইতে তাপ বা আলো কিছুই পাওয়া যায় না। যিনি তাপ বা আলোকপ্রার্থী, তাঁহাকে উদ্দীপিত অগ্নির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে—যে কোন কারণে, যে কোন উপায়ে, কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে সেখান হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রজ্বলিত প্রদীপের সংস্পর্শে তাহাকে আপন বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া লইতে হইবে।

জি। কিন্তু যে তাপ বা আলোক চায় না?

ব। তাহার পক্ষে ত কোন শঙ্কাই নাই। কিন্তু জীবের ত সে অবস্থা নহে। সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকে অন্ধকার দূর করিতে হইবে। যে আলো জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান আছে—তাহা হইতে অন্ধকার দূর হয় না। কারণ, তাহা অন্ধকারেও বর্ত্তমান আছে। তাহার সঙ্গে কিছুরই বিরোধ নাই। অন্ধকার দূর করিতে হইলে অভিব্যক্ত আলোকের আবশ্যকতা। সেই প্রকার সর্ব্বত্র-ব্যাপক বিশুদ্ধ চৈতন্য হইতে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না।

যদিও অন্তরাত্মা বা পরমাত্মরূপে তাহা জীবেও আছে বটে, তথাপি তাহা অজ্ঞান-নিবর্ত্তক নহে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য যে আধারে জ্ঞান বা বিদ্যারূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে, প্রজ্বলিত হইয়া আছে, সেখান হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞানের নাশ করিতে হইবে। যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে তাহাকেই গুরু বলে। একটি জ্বলন্ত দীপের সংস্পর্শে যেমন অপর একটি প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ ঐ উজ্জ্বল আধারের স্পর্শে যখন বদ্ধ জীবের নিজের আধারেও সুপ্ত অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তখন নিজের অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠেন। তখন ভিতরেই গুরুকে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি জীবের নিত্যসহচর, চিরদিনের সখা, যিনি সৃষ্টির প্রবাহকাল হইতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্ম ও ভোগের মূক দর্শকরূপে চলিয়া আসিতেছেন, তিনি জীবের অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষ হন। তখন বাহিরের গুরুতেই অন্তরের গুরুর দর্শন পাওয়া যায়।

তবে মনে রাখিও, ঐ আধারে যে অগ্নি আলো দিতেছে, এই আধারেও সেই অগ্নিরই প্রকাশ। অগ্নি আধার ভেদে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশমান হইলেও অগ্নিরূপে সত্তা এক ভিন্ন দুই নহে। প্রজ্বলিত অগ্নিই গুরু।

জি। সাধারণ জীবের মধ্যে কি প্রজ্বলিত অগ্নি নাই?

সুপ্ত অগ্নি ত আছেই—কিন্তু প্রদীপ্ত অগ্নি কি জীবে নাই ?

ব। প্রদীপ্ত অগ্নিও আছে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে—তাহার সঙ্গে জীবের জ্ঞানতঃ যোগ নাই। সহস্রারে সে আগুন নিত্য প্রকাশমান হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু বহির্মুখ জীব তাহার সন্ধান রাখে না। জীবকে সেই জন্য অন্তর্মুখ হইয়া নিজের সুপ্ত আগুন জাগাইতে হয়। পরে সেই আগুনের সহায়তায় সহস্রারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে গমন করিতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষাতত্ত্ব—মন্ত্র ও দেবতা

জিজ্ঞাসু। গুরু যে বস্তুতঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহা বুঝিলাম। যে স্বচ্ছ আধারে পরমেশ্বরের স্বরূপ-শক্তি প্রকাশিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাও গুরুপদ-বাচ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই, গুরু কি প্রণালীতে শিষ্যের অন্তঃকরণে জ্ঞান-শক্তি সঞ্চার করেন।

বক্তা। যাহাকে জ্ঞানশক্তির সঞ্চার বলিতেছ তাহাকে প্রকারান্তরে শিষ্যের হৃদয়স্থিত সুপ্ত জ্ঞান-শক্তির উদ্বোধনও বলিতে পার। ইহাকেই গুরু-কৃপা বলে। এই কৃপা-প্রকাশের প্রণালী বা পদ্ধতিকে শাস্ত্রকারগণ দীক্ষা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দীক্ষা ভিন্ন জীবের পশুত্ব ঘুচে না—পাপক্ষয় হয় না,—বিশুদ্ধ অবস্থার উপলব্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহার দীক্ষা হয় নাই, তাহার দেহ অশুদ্ধ। অশুদ্ধ দেহে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিতে অধিকার নাই। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে জীবের সদ্‌গতি লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। শাস্ত্রে বহুপ্রকার দীক্ষার বর্ণনা থাকিলেও দীক্ষা-ব্যাপার সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন।

জি। দীক্ষা না হইলে ইষ্ট দেবতা বা ভগবানের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না কেন? হৃদয়ে যদি ভক্তি থাকে, তাহা হইলে দীক্ষা না হইলেই বা ক্ষতি কি? নৈতিক উৎকর্ষ, ব্যাকুলতা এবং সরল বিশ্বাস থাকিলে, ভগবৎ-কৃপালাভে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে দীক্ষানুষ্ঠান একটি কৌলিকপ্রথা বা আচার ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ব। সকল গভীর জিনিষই কালক্রমে গভীরতা হারাইয়া প্রথামাত্রে পরিণত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উহার মূল তত্ত্ব নষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র পরমেশ্বরই জগতের আদিগুরু। তাঁহা হইতে নানা-দিকে নানারূপ জ্ঞান-স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। যে কোন ধারায় তাঁহার কোন বিশিষ্ট শক্তি প্রকটিত হইয়াছে, সেই ধারায় নিরবচ্ছিন্নরূপে চৈতন্যের প্রকাশ থাকে। গুরুর শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়, শিষ্যের শক্তি তাহার শিষ্যে—এই প্রকার একটি একটি করিয়া প্রতি আধারে ক্রমশঃ শক্তির ধারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গুরু-শিষ্য-পরম্পরাকেই শাস্ত্রে সম্প্রদায় বলা হইয়াছে। গুরু দীক্ষাদ্বারা শিষ্যকে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন। তখন সম্প্রদায়-ক্রমে যে শক্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, উহা শিষ্যের

হৃদয়েও অভিব্যক্ত হয়। এই জন্যই সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র অথবা ক্রিয়া সবই বিফল। দীক্ষার ফলে জীব শুধু যে পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষ লাভ করে, তাহা নহে, ঐ শক্তির প্রকাশ যে-কোন আধারে আছে, তাহার সঙ্গেও যোগ-যুক্ত হইয়া যায়।

জি। দীক্ষা বস্তুতঃ একবার হয় কি বহুবার হয়?

ব। প্রকৃত দীক্ষা একবার ভিন্ন বহুবার হয় না, কিন্তু না হইলেও স্তরে স্তরে নব নব রূপে শক্তির উন্মেষ হওয়ার দরুণ বহুবার দীক্ষা হয় বলিলেও দোষ হয় না। ইহাকেই ক্রমদীক্ষা বলে। কিন্তু দীক্ষার যাহা মুখ্য লক্ষণ, তাহা সকলের অন্তিম স্তরেই প্রকাশিত হয়। জ্ঞানশক্তি একবার ভিন্ন দুইবার অভিব্যক্ত হয় না। সুতরাং দীক্ষাও বার বার লইবার প্রয়োজন হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ মানুষের যে প্রকার মানসিক অবস্থা, তাহাতে প্রথম অবস্থাতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার সম্ভবপর নহে। এই জন্য কর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয়। শিষ্য গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে। জ্ঞানের পূর্ণতা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কৃপা-দৃষ্টি-সাপেক্ষ। ইহা হইলেই পূর্ণাভিষেক সম্পন্ন হয়, জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করে। ইহাই প্রকৃত দীক্ষা। ইহার

অব্যবহিত পরেই মুক্তি হয়। বলা বাহুল্য, এই দীক্ষা সকলেই জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের নিকটই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জি। চরম দীক্ষার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। কারণ, তাহা স্বয়ং পরমেশ্বর মুক্তিদানের পূর্ব্বে প্রত্যেক জীবকে দিয়া থাকেন। কিন্তু যে দীক্ষাতে প্রধানতঃ কর্ম্মেরই উপদেশ থাকে এবং যাহার গুরু পরমেশ্বর-ভাবাপন্ন জীব, সে-সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

ব। তোমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

জি। দীক্ষা-প্রসঙ্গে মন্ত্র ও দেবতা বিচারের সার্থকতা কি? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মন্ত্রের আবশ্যকতা কি? দেবতার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ কি? শিষ্যের অধিকার নির্ণয়ের প্রয়োজনই বা কি? এই প্রকার বহু প্রশ্নই দীক্ষা-তত্ত্বের আলোচনাকালে মনোমধ্যে উদিত হয়।

ব। বৎস, দীক্ষার স্বরূপ এক হইলেও আধার-ভেদে দীক্ষার প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে। তদ্রূপ ইষ্ট-দেবতা ও মন্ত্র পরমার্থ দৃষ্টিতে অভিন্ন হইলেও সাধকের সাধন-ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাহাতে ভেদ আরোপিত হয়।

জি। ইষ্ট-দেবতা ও মন্ত্র-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে দীক্ষা-সম্বন্ধে আমি আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

আমার প্রশ্ন এই—দীক্ষা যখন শক্তি-সঞ্চার-মূলক এবং শক্তি যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন মন্ত্র ও দেবতাদির বিচারের আবশ্যকতাই বা কি? আর সে বিচার কি প্রকারে করিতে হয়, তাহাও জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইতেছে।

ব। বৎস, সকল মনুষ্য সমান অধিকার-সম্পন্ন নহে বলিয়াই এই বিচারের ব্যবস্থা। যদি সকলেরই অধিকার এক প্রকার হইত, তাহা হইলে অবশ্য বিচারের আবশ্যকতা হইত না। দেখ, যিনি সুচিকিৎসক, তিনি রোগ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে রোগের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। তার পর সেই বিশিষ্ট রোগ অনুসারে বিশিষ্ট ঔষধের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রোগের সামান্য লক্ষণ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের বিশেষ লক্ষণ না জানা থাকিলে কোন্ ঔষধ কোন্ রোগীর পক্ষে উপযোগী, তাহার নিরূপণ হইতে পারে না। সেই প্রকার বিচারশীল আচার্য্য মনুষ্যের অধিকার ও যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে তাহার সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই অধিকার বিচার ঠিক ঠিক ভাবে হয় না বলিয়াই

আজকাল অনেকস্থলে সাধনার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব-গম্য হয় না। যদি রোগ-নির্ণয় সত্য হয়, ঔষধ-নির্ব্বাচন সত্য হয়, ঔষধের ব্যবহার নিয়মিত হয় এবং কোন প্রকারে প্রতিকূল আচারের দ্বারা রোগীর স্বাস্থ্য-মর্য্যাদার লঙ্ঘন না ঘটে, তাহা হইলে ঔষধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনা-ক্ষেত্রেও ঠিক এই প্রকার হইয়া থাকে। যদি সাধকের চিত্তস্থ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের সাধন-সংস্কার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া তাহার অধিকার নিরূপণ করা যায়, যদি সে সেই অধিকার অনুরূপ শক্তির উদ্বোধন ও সাধনক্রম প্রাপ্ত হয়, যদি সে ঐ নির্দ্দিষ্ট পথে যথাবিধি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা সংযম এবং উৎসাহের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধনায় তৎপর থাকে, এবং যদি সে শাস্ত্রবিগর্হিত অসদাচারের প্রশ্রয় দান না করে—তাহা হইলে সাধনার ফল প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অভ্যাস ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সাধকের কর্ত্তব্য এবং অধিকার-নির্ব্বাচন এবং তদনুসারে সাধনার মার্গ-নির্দ্দেশ গুরুর কর্ত্তব্য। তুমি যে দীক্ষা-সংক্রান্ত বিচারের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তাহা গুরুর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। এই বিচার কিরূপ, তাহা সংক্ষেপে তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। মানুষের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস

শুধু এক জীবনেই আবদ্ধ নহে। তুমি আজ যে অবস্থায় আছ, তাহা যেমন তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের জ্ঞান ও কর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, তোমার বর্ত্তমান জন্মও সেই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের ফল-স্বরূপ। কর্ম্ম-সংস্কার হইতেই দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে,—দেহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সংস্কার স্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায়। একটি বৃক্ষ যেমন সূক্ষ্মভাবে বীজের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং ঐ বীজ বিশ্লেষণ করিলেই ভবিষ্যৎ বৃক্ষের সমগ্র ইতিহাস জানিতে পারা যায়, সেই প্রকার গর্ভাধানকালে পিতার বীর্য্য ও মাতার রজঃ সংযুক্ত হইয়া যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ দেহের বিকাশ হয়—ঐ দেহাশ্রিত জীবনের ইতিহাস ঐ বীজকে বিশ্লেষণ করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে নাদ, বিন্দু ও বীজের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে স্বরূপতঃ এই পিতৃভাব, মাতৃভাব ও উভয়ের সংঘটন-জনিত সন্তান-ভাবের ব্যাপার মাত্র। সৃষ্টির মূল-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়া ইহা আয়ত্ত করিতে পারিবে। ঐ বীজে যেমন অনাগত অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনই অতীত অবস্থারও সন্ধান পাওয়া যায়। যোগী ও

বিজ্ঞানবিৎ দেহের বীজ প্রত্যক্ষ করিয়া উহা হইতে একদিকে পিতা ও মাতার সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং অপর দিকে উৎপন্ন জীবের পূর্ব্বজন্মের পরিচয় প্রাপ্ত হন। মনুষ্যের চিত্তে যে সকল সাধন-সংস্কার নিহিত আছে তাহার সম্যক্ নিদর্শন এই বীজাবস্থাতেই দৃষ্টি-গোচর হয়। গুরুর প্রথম কর্ত্তব্য, এই সাধন-সংস্কারের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহার অনুকূল ভাবে সাধকের গতি নির্দ্দেশ করা। মনে কর, একজন লোক কোন জন্মে গোপাল-মন্ত্রের উপাসনা করিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়া পরলোক গমন করিল। বলা বাহুল্য, উপাসনা হইতে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই লোকটির দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। এই ক্ষেত্রে যদি পরবর্ত্তী মনুষ্য-জন্মে ঐ লোকটির সাধন-পথ নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা হয়, তবে গুরুর কর্ত্তব্য ঐ পূর্ব্বসংস্কার অবগত হইয়া তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের সাধন-পথে স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবার শক্তি দান করা। কর্ম্মফল কখনই নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত সাধন-সংস্কারকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, বর্ত্তমান জন্মে উহার অনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। নতুবা উহা বিনষ্ট না হইলেও নিষ্ক্রিয় ভাবে চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে,—উহা নিষ্ফল না হইলেও কার্য্যতঃ এক প্রকার নিষ্ফল। যিনি যোগী ও

সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাকে এই পূর্ব্বসংস্কার প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ সাধনার উপদেশের দ্বারা উহারই ক্রমিক পুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মে যদি তোমার গোপাল-উপাসনা চারি আনা মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান জন্মে যদি তুমি ঐ পথে চালিত হইতে পার, তাহা হইলে চারি আনা সাধনা করিয়াই আট আনার ফল লাভ করিতে পারিবে। কেন না, সাদৃশ্য বশতঃ পূর্ব্বজন্মের সাধন-সংস্কার বর্ত্তমান জন্মের সাধনা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া উহার পোষণ করিয়া থাকে।

এই প্রকারে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলেও পূর্ব্ব পথের সঙ্গে যোগ ভ্রষ্ট হয় না বলিয়া ক্রমশঃই সাধনার বিকাশ হইতে থাকে। এই বিকাশেরও একটি মাত্রা আছে—সেই মাত্রা পূর্ণ হইলে সাধনা বা উপাসনারূপ কর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞানে পরিণত হয়। যিনি গোপাল-উপাসনায় অভ্যাস দ্বারা প্রতিজন্মেই কিছু কিছু নূতন সংস্কার আধান করিতে পারেন, তাঁহার গোপাল-সাধনা উত্তরোত্তর উপচয় প্রাপ্ত হইয়া একদিন সিদ্ধি বা জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে। তোমরা অনেক সময় শুনিতে পাও যে, কোন কোন সাধক অল্প পরিশ্রম পরিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ইহা অসম্ভব কথা নহে। কিন্তু বাস্তবিক

পক্ষে কর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ না হইলে কেহই সিদ্ধি বা জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। তবে যে বর্ত্তমান জন্মে অল্প পরিশ্রমেও কাহারও সিদ্ধিলাভের কথা শুনা যায়, তাহার কারণ, তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনার সংস্কারের মাত্রা খুব অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে বর্ত্তমান জন্মে সাধনার আবশ্যকতা খুব বেশী হয় না। ঠিক পথে অল্প পরিমাণ পরিশ্রম করিতেই ঐ সকল পূর্ব্ব সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কারের সহিত মিলিত হয় ও জ্ঞানের বিকাশ করে। স্থূলদর্শী ব্যক্তি এই প্রকার অল্প পরিশ্রমে অধিক ফল দেখিতে পাইয়া ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অমূলক দোষের উদ্ভাবন করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে, সাধনের উপদেশ-দাতার দায়িত্ব কত অধিক। পূর্ব্ব সংস্কারের বিচার না করিয়া উপদেশ দিলে তাহা অধিকাংশ স্থলেই নিষ্ফল হইয়া থাকে। এইজন্যই প্রকৃত যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। এই যে বিচারের কথা বলিলাম, ইহা অন্ততঃ তিন জন্মের সংস্কার লইয়া করিলে ভাল হয়, কারণ তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে অধিক পরিমাণে অনুকূল সংস্কারের সমষ্টি পাইবার সম্ভাবনা থাকে। জাতকের প্রকৃতি বিচার করিয়া তাহার অনুরূপ মন্ত্র ও দেবতার ব্যবস্থা যে তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে

পাওয়া যায়, তাহারও তাৎপর্য্য ইহাই। কিন্তু যোগদৃষ্টি না থাকিলে শুধু গ্রন্থোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিয়া অভ্রান্তভাবে মানব-প্রকৃতির বিচার করা চলে না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যেমন গণনার সাঙ্কেতিক প্রণালী আছে, তন্ত্র-শাস্ত্রেও সেই প্রকার আছে। কিন্তু শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব অবগত না হইলে এবং নিজের দৃষ্টিশক্তি সাধনা দ্বারা নির্ম্মল করিতে না পারিলে গণনা কখনই অভ্রান্ত হইতে পারে না। উপাদানগত সাদৃশ্য বিচার করিয়া যেমন পতি ও পত্নীর পরস্পর সম্বন্ধের ব্যবস্থা করিতে হয়, তেমনই উপাদান-সাদৃশ্যের উপরেই মন্ত্র ও দেবতার নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত। যাহার যে প্রকার স্বভাব, তাহার উপাস্যও সেই প্রকার। কিন্তু কোন ব্যক্তির স্বভাবের পরিচয় একমাত্র যোগ-দৃষ্টিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দীক্ষা দান করিতে হইলে যোগের দ্বারা প্রকৃতি ও সংস্কারের বিচার অত্যাবশ্যক।

জি। আচ্ছা, বিচারের আবশ্যকতা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু দেবতা-নিরূপণ হইলেই ত সাধকের উপাসনা-কার্য্য চলিতে পারে—মন্ত্র-বিচারের আবশ্যকতা কি? মন্ত্রের সহিত দেবতার সম্বন্ধই বা কি?

ব। দেবতার নিরূপণ হইলে মন্ত্র-বিচারের বাকী কি থাকিল? মন্ত্র ও দেবতায় কোন পার্থক্য নাই, দেবতার স্বভাবিক নামকেই—অর্থাৎ যে নাম ধরিয়া

ডাকিলে দেবতার আবির্ভাব বা অন্য প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলে। নাম না জানা থাকিলে অনন্ত সত্তার গর্ভ হইতে নিজের ইষ্ট-মূর্ত্তিকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। নামের সহিত রূপের নিত্য সম্বন্ধ। নামকে আশ্রয় করিলে রূপের প্রকাশ আপনিই হইয়া থাকে। দেবতা বাচ্য, মন্ত্র তাহার বাচক—উভয়ের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ।

জি। দীক্ষার সময়ে গুরু মন্ত্রই দিয়া থাকেন, তিনি ত ইষ্ট দেবতার রূপ দেখাইয়া দেন না। তবে কি ইষ্ট-মূর্ত্তি ধ্যানানুসারে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লইতে হইবে?

ব। বৎস, গুরু মন্ত্রই দেন বটে, কিন্তু মন্ত্র ত অক্ষর-সমষ্টি মাত্র নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে উহা হইতে বিবেকশীল বিচারবান্ জীবের পক্ষে কোনই সুফলের আশা ছিল না। বস্তুতঃ মন্ত্র চৈতন্য-স্বরূপ—চিৎশক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। উহা শব্দের আশ্রয়ে প্রকটিত হইলেও স্বরূপতঃ জড় পদার্থ নহে। মন্ত্র যে কত বড় প্রবল শক্তি, তাহা যথাবিধি মন্ত্রের কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

গুরু যখন শিষ্যের কর্ণমূলে মন্ত্র দান করেন, তখন বাস্তবিক পক্ষে শব্দবাহী জ্ঞান বা চৈতন্য-শক্তিরই সঞ্চার করিয়া থাকেন,—ইহাই দেবতার স্বরূপ

সদ্‌গুরুর প্রদত্ত মন্ত্র শব্দ-মাত্র নহে, উহা চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা দেবতার আত্মপ্রকাশ। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যক্ষ-অনুভূতির সমকালে শিষ্য-হৃদয়ে সংক্রমণ করেন, সেই জন্য এই চেতন মন্ত্র বা সিদ্ধ মন্ত্রের আলোচনা করিতে করিতেই শিষ্যের অন্তঃকরণে দিব্য চৈতন্য-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হইলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয় না। ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া তদনুসারে মনোময়ী মূর্ত্তি গঠন করা কল্পনার খেলা, ইহা প্রকৃত উপাসনার অঙ্গ নহে। মন্ত্র ও দেবতা যখন অভিন্ন, শুধু প্রকাশ-কালের তারতম্য বশতঃ ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তখন মন্ত্রের সহিত সাধকের মনের সংঘর্ষ হইতে দেবতার মূর্ত্তি আপনা আপনিই ফুটিয়া উঠে, তজ্জন্য ভাবনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। মন্ত্র-চৈতন্য না হইলে শুধু শব্দ হইতে এই প্রকারে জ্ঞানের বিকাশ সহজসাধ্য নহে। নবীন সাধকের পক্ষে মন্ত্রকে চেতন করিয়া লইয়া তাহার আরাধনা করা অতি কঠিন। এইজন্য গুরুই বিচারপূর্ব্বক মন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ বা সিদ্ধ করিয়া—অর্থাৎ উহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক—শিষ্যকে প্রদান করেন। সুতরাং যিনি নিজে অসিদ্ধ বা অজ্ঞানী, তিনি গুরু নামের অধিকারী নহেন।

জি। মন্ত্র বলিতে কি আপনি নামকে লক্ষ্য করিতেছেন অথবা বীজকে লক্ষ্য করিতেছেন? বীজ ত নিরর্থক অক্ষর-সমষ্টি মাত্র।

ব। বৎস, আমি প্রধানতঃ বীজকেই লক্ষ্য করিতেছি—বীজই মূল মন্ত্র। শাখা পল্লব পুষ্প ফল সবই সুন্দর বটে, কিন্তু বীজ না হইলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না এবং এই সকল সুন্দর বস্তু আপন সত্তা লাভ করিতে পারে না। দেব-তত্ত্বের বিচারেও বীজের স্থান সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ,—বীজের মহত্ত্ব ও শক্তি অচিন্ত্য, অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীজ-মন্ত্র-প্রভাবেই দেব-দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় জাগতিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা আমি একটি একটি করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতে পারি। বীজ সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন—ইহার সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। বীজের অর্থ নাই, কে বলিল? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার অর্থ নিরূপণে অপারগ, ক্ষুদ্র মনুষ্য তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যায়, ইহা হইতে প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে?

জি। প্রণবের সঙ্গে বীজের সম্বন্ধ কি? বীজ ভিন্ন প্রণব কিংবা প্রণব ভিন্ন বীজের সাধনা চলিতে পারে কি?

ব। বৎস, এ সকল অত্যন্ত গুহ্য বিষয়। তবে তোমার আগ্রহ-নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি।

প্রণবের সঙ্গে বীজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রণব বীজের পুট স্বরূপ—বীজ শক্তি, প্রণব উহার ব্রহ্মরূপী সেতু। তুষ ভিন্ন শুধু তণ্ডুল কিংবা তণ্ডুল ব্যতিরেকে শুধু তুষ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্বৎ বীজ ভিন্ন প্রণব কিংবা প্রণব ভিন্ন কেবলমাত্র বীজ ফল উৎপাদন করে না। উভয়ের সম্বন্ধ আবশ্যক। তবে বীজের মধ্যে প্রণবের উপাদান অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রণবকে গ্রহণ না করিলেও যথাসময়ে উহা আপনিই ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। কিন্তু শুধু প্রণব নিষ্ফল।

তবে পূর্ব্বে বীজ সংগৃহীত থাকিলে প্রণব তাহার বিকাশে সাহায্য করিতে পারে। আলোক, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও যেমন বীজ ভিন্ন বৃক্ষ হইতে পারে না, সেই প্রকার বীজ না থাকিলে কেবল প্রণব হইতে পরমামৃতের আস্বাদন পাওয়া যায় না। প্রণবের কার্য্য প্রস্ফুটিত করা, প্রকাশিত করা, অব্যক্ত সত্তাকে অভিব্যক্ত করা—কিন্তু যাহাকে ফুটাইতে হইবে বা প্রকাশিত করিতে হইবে, তাহা ত চাই। তাহাই সত্ত্ব বা শক্তি—যাহা বীজ-মন্ত্রের বাচ্যার্থ। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপহিত চৈতন্যই দেবতার তত্ত্ব।

জি। বাবা, প্রণবের অধিকার কি সকলেরই আছে ?

ব। না। স্ত্রীদেহ ও শূদ্রাদিদেহ সাক্ষাদ্ভাবে প্রণবসাধনার যোগ্য নহে। কেন যোগ্য নহে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায়। দীর্ঘকালের সংঘর্ষের ফলে ব্রাহ্মণাদির দেহ প্রণবের তেজে স্বভাবতঃই তেজোময়, তাই প্রণব-গ্রহণের অধিকারী। যে অবস্থা-লাভ শূদ্রাদির পক্ষে প্রণবে অধিকার না থাকিবার দরুণ বহুকালের প্রযত্নসাধ্য, তাহা প্রণবের সাহায্যে ব্রাহ্মণাদি শীঘ্রই লাভ করিতে পারেন। শূদ্র প্রণবাদি মন্ত্রের ধারণা করিতে পারে না—যিনি শূদ্রকে প্রণব দিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি বস্তুতঃ তাহার অপকারই করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেও তাহাই। স্ত্রী-দেহের এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে, অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুল-সম্ভূত হইলেও উহা প্রণব-গ্রহণের যোগ্য নহে। স্ত্রীদেহে গর্ভধারণ হওয়ার জন্য কুণ্ডলিনীশক্তির অবস্থিতি একটু স্বতন্ত্রভাবাপন্ন। তবে মনে রাখিও যে, পূর্ব্ব-জন্মার্জিত সাধন-সংস্কার বর্ত্তমান থাকিলে যথাসময়ে ভিতর হইতেই প্রণব জাগিয়া উঠে—বীজমন্ত্র আপনা আপনিই প্রণবের দ্বারা পুটিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহা অতি বিরলাবস্থা—কিন্তু অসম্ভব নহে। মতঙ্গ প্রভৃতি ঋষি এবং মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে পার। বীজ হইতে

প্রণবের আবির্ভাব হইতে পারে। সুতরাং প্রণব না দিয়া ক্ষেত্র-বিশেষে কেবল বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণাবস্থায় কেবল প্রণবের দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না। উহা হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত নির্ব্বাণ বা সত্তাবোধের লোপ হইবার সম্ভাবনা।

জি। প্রণব বা অন্যান্য মন্ত্র কি প্রত্যক্ষ করা যায়?

ব। যায় বই কি? নাভি হইতে প্রণব প্রভৃতি সকল মন্ত্রই উদিত হয়—মূলাধার হইতেও বলিতে পার। কুণ্ডলিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হইলেই একটি নাদময়ী শক্তির ধারা সুষুম্না-পথে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে থাকে। তখন সহস্রার হইতে অপর একটি ধারা প্রবাহিত হইয়া অধোমার্গে আসিতে থাকে। আজ্ঞাচক্রে বিন্দুস্থানে ঐ দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ সম্মিলিত হইয়া একটি সুস্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও কমনীয় জ্যোতির আকারে প্রকাশিত হয়। উহা বহিরাকাশে প্রতিফলিত হইলেই নেত্রের সম্মুখে বাহ্যভাবে প্রত্যক্ষ হয়। যে যোগী নাভি-ধৌতি ও কিরত-ধৌতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে ধৌতি-কালে একটি জ্যোতিঃ-প্রবাহ স্তম্ভাকারে বহির্গত হইয়া বক্রভাবে স্বতঃই শিরোদেশে গমন করে ও দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বাহির হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক ধনুর আকার দেখিতে

পাওয়া যায়। মন্ত্রশক্তি তীব্রভাবে বাহ্যাকাশে প্রকাশিত হইলে সমীপস্থ দুর্ব্বল দর্শকের পক্ষে উহাতে জ্ঞান হারাইবার সম্ভাবনা। বৎস, যাহা কিছু অন্তরাকাশে অথবা দহর-কমলে প্রকাশিত হয়, তাহাকে বাহিরে আনিয়া ইন্দ্রিয়গোচরভাবে নিজে দর্শন অথবা অপরকে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তবে এ সকল অতি গুহ্য তত্ত্ব অনধিকারীকে দেখান উচিত নহে।

জি। আমরা যে হৃদয়-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতির বর্ণনা শাস্ত্র-মুখে শুনিতে পাই, তাহা কল্পনা নহে—প্রত্যক্ষ সত্য। আপনি আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যেদিন নাভি-কমল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রের তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই আমার এ ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছে। এখনও আমার মানস-নয়নে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে।

ব। বৎস, তোমাকে মৃণাল সহকারে প্রস্ফুটিত নাভিপদ্ম নাভি-মার্গে বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলাম। প্রয়োজন হইলে হৃদ্‌পদ্মও আর একদিন বাহির করিয়া দেখাইয়া দিব। নাভি-কমলের বর্ণ যেমন বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তিমাভাযুক্ত, হৃদয়-কমল সে প্রকার নহে। প্রত্যেকটি কমলই বাহির করা যায়। এ-সব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ সত্য। আজকাল দুই পাতা

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং ঈশ্বরকল্প ঋষিগণের বাক্যেও আমরা শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছি—ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর পাশ্চাত্য শিক্ষারই বা দোষ কি? দেশে কর্ম্মী ও তত্ত্বদর্শীর অভাব হইয়াছে,—সাধন-জগতের কোনও নিগূঢ় ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যদি সে ক্ষমতা কাহারও থাকিত, যদি ধর্ম্মের নামে কপটতা ও প্রবঞ্চনা এতটা প্রসার লাভ না করিত, তাহা হইলে লোকের মনে এ প্রকার গভীর অবিশ্বাস উৎপন্ন হইত না। তুমি যে বিষয়ে উপদেশ দান করিবে, যদি তাহা তুমি নিজে কখনও উপলব্ধি না করিয়া থাক, এবং অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার ক্ষমতাও তোমার না থাকে, তাহা হইলে তোমার উপদেশের মূল্য কি? বলিতে পার—তুমি ঋষি-বাক্যের অনুসরণ করিয়া উপদেশ দিতেছ। সত্য কথা, কিন্তু তুমি যে ঋষি-বাক্য ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? যাহা হউক, তবুও ইহা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তবে যদি তুমি স্বয়ং ঐ বাক্যের অর্থ নিজে অনুভব করিয়া উহা প্রয়োগ করিতে, তাহা হইলে অবশ্য উহার শক্তি বৃদ্ধি হইত।

জি। ঐ যে জ্যোতির কথা বলিলেন, উহা কি মন্ত্রেরই প্রকাশ?

ব। নিশ্চয়ই। মন্ত্রই ক্রিয়া-কৌশলে জ্যোতীরূপে ফুটিয়া উঠে—ইহা দিব্য জ্যোতিঃ। দীর্ঘ সময় অভ্যাস করিলে জ্যোতির মধ্যে রূপ অথবা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—বস্তুতঃ যাহা জ্যোতিঃ বলিয়া মনে হয়, তাহা ঐ রূপেরই অঙ্গপ্রভা মাত্র, অথবা জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়। বাষ্প ও বরফে যেমন ভেদ নাই; জ্যোতিঃ ও রূপেও তেমনই ভেদ নাই—দুই-ই এক বস্তু। ব্যবধান কালে যাহা জ্যোতিঃ, ব্যবধানান্তে নৈকট্য হইলে তাহাই মূর্ত্তি—এক চৈতন্যময়ী সত্তাই উভয়ভাবে প্রকাশিত হয়। জ্যোতিকে নিরাকার তত্ত্ব মনে করিতে পার এবং মূর্ত্তিকে সাকার বলিয়া ধরিয়া লইতে পার—কিন্তু মনে রাখিও, সাকার ও নিরাকার পৃথক্ বস্তু নহে। যেখানে আকার আছে, সেখানেই নিরাকারও আছে—সেই জন্যই ত আকার অবলম্বন করিয়াও নিরাকারের উপলব্ধি হইতে পারে, আকারের মধ্যে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা নাই। আর যাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাতেও অনন্ত প্রকারের আকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। সকল আকার সমসূত্রে অবস্থান করিলে কোন আকারেরই অভিব্যক্তি হয় না—সেই সাম্যাবস্থাকেই নিরাকার বলে। তাহা অনন্ত আকারের সমন্বয় ভিন্ন অপর কিছু নহে। যাঁহার আকারের

নির্ণয় নাই, ইয়ত্তা নাই, পরিচ্ছিন্নতা নাই, তিনিই নিরাকার। সুতরাং দেবতাকে নিরাকার জ্যোতিঃ বা চৈতন্যস্বরূপ বলিলেও কোন দোষ নাই অথবা জ্যোতির্ম্ময় আকার বিশিষ্ট বলিলেও কোন দোষ নাই। সাধক বা ভক্তের ইচ্ছানুসারেই আকারের স্ফুরণ হয়। নিরাকার যখন অনন্ত আকারের সাম্যাবস্থা, কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে যখন তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তখন উপাসকের আকাঙ্ক্ষানুসারে উহা হইতে যে-কোন আকারের অভিব্যক্তি না হইবে কেন? মন্ত্র হইতেই জ্যোতিঃ ও রূপের বিকাশ হয়, মন্ত্রই দেবতার স্বরূপ—বাচ্য ও বাচকে বাস্তবিক পার্থক্য কিছুই নাই।

জি। সত্যই কি দেবমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে? অনেকে দেব দর্শনের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহা যে উপাসকের কল্পনা-প্রসূত নহে, তাহার প্রমাণ কি? স্বপ্নাবস্থায় কত রূপ প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহা যে অলীক, তাহা ত সকলেই জানে। তদ্রূপ, ধ্যানাবস্থায় যে দর্শন হয় তাহাও ত মিথ্যা হইতে পারে? তীব্রভাবে চিন্তা করিলে চিন্তার অনুরূপ মূর্ত্তি দর্শন হইতে পারে, কিন্তু তাহার সত্যতা কোথায়?

ব। এই জন্যই বীজ-মন্ত্রের আবশ্যকতা। বীজগর্ভে যদি শক্তি থাকে, তবে তাহা ক্ষেত্রে পতিত হইলে যথাকালে অঙ্কুরাদিক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়। বৃক্ষের চিন্তা না

করিলেও বৃক্ষের বীজ ভূমিতে পতিত হইলেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে—যদি প্রতিবন্ধক না থাকে। ঠিক সেই প্রকার বীজকে চেতন করিয়া, অর্থাৎ শক্তি-সংযুক্ত করিয়া, তাহার সাধনা করিলে বীজ-মন্ত্র হইতে দেবতার আবির্ভাব হইবেই। দেবতার অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি ধ্যান করিয়া ফুটাইবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যবহারক্ষম সত্য পদার্থ। শুধু ছবি ধ্যান করিয়া ঐরূপ সত্য বস্তুর আবির্ভাব সহজে হয় না। যে দৃষ্টিতে তুমি, আমি ও জগৎ সত্য পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, সেই দৃষ্টিতে দেবতারও সত্তা আছে।

জি। দেবতার সঙ্গে কি সাধক সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন—দেবতা কি সাধকের কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেবতাকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

ব। বৎস, সমগ্র জগৎটিই ত মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। যাহা এখন দেখিতেছ, বা ভাবিতেছ, বা বলিতেছ, সবই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অথচ সবই সত্যস্বরূপ। যে-ভাবে এই জগতের যাবতীয় পদার্থ সত্য, ঠিক সেই ভাবেই দেবতাও সত্য। দেবতা আবির্ভূত হইয়া কথা বলেন বই কি? ভক্ত যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর দেন, ভক্তকে সর্ব্বদা সৎপথে চালিত

করেন, ভক্তের মনোরঞ্জন করেন, ভক্তের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করেন, সবই করিয়া থাকেন। যে-ভাবে তুমি-আমি কথা বলি বা বাদ-প্রতিবাদ করি, ঠিক সেই ভাবেই তাঁহার সঙ্গেও বাদ-প্রতিবাদ হয়, হাস্য-পরিহাস হয়। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। ভক্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন, কোলে লইয়া প্রেমের সহিত চুম্বন করিতে পারেন, মাতৃভাবে আসিলে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া সত্যই শয়ন করিতে পারেন। ভক্ত যেমন ভাবে তাঁহাকে সাজাইতে চান, তিনি তেমনই সাজিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবেই ভক্তের অধীন।

জি। বাবা, তাঁহার দর্শন হইলে কি জীবের আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না?

ব। যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা যদি সে সত্যই প্রাপ্ত হয়, তবে আর তাহার কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? কিন্তু ইষ্ট-প্রাপ্তির একটা ক্রম আছে। যত দিন প্রাপ্তির পূর্ণতা না হয়, ততদিন অবশ্য প্রার্থনা থাকেই, কিন্তু চরমাবস্থাতে সকল প্রার্থনাই নিবৃত্ত হইয়া যায়। মন্ত্রাত্মক ব্রহ্মতেজঃই দেবতা—সাধককে আরাধনা করিবার সময় স্বয়ং দেবতা হইতে হয়। নিজে তেজোময় হইয়া সেই তেজঃকে বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক অর্থাৎ নিজেকে নিজের সত্তা হইতে বিবিক্ত করিয়া

পৃথগ্‌ভাবে দর্শন করিতে হয়। যদি ন্যাস প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন হয়, তবে সাধকের দেহ ও চিত্ত উভয়ই মন্ত্রময় হইয়া যায়। কিন্তু যোগাভ্যাস ভিন্ন তাহা হওয়ার উপায় নাই। সুচিরকাল সাধুমার্গে অবস্থান করিয়া যোগাভ্যাস করিলে নিজের সত্তা দেবতাময় হইয়া পড়ে—দেবতার জ্যোতিঃ, রূপ, শক্তি ও সত্তা, সবই নিজের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য ও ক্রিয়ার প্রভাব বশতঃ সাধক তখন স্বয়ংই সাধ্যরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তথাপি উভয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকে। ভক্ত সে ভেদটুকু যত্ন-পূর্ব্বক পোষণ করেন। তাহা না থাকিলে বোধহীন সুষুপ্তিবৎ ঘোর মোহে আচ্ছন্ন হইবার ভয় থাকে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—একথা খুবই সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, দেবতা হইয়াও যখন দেবতার যজন হইতে পারে, তখন উপাস্য ও উপাসকে একটা ভেদ যে থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যতক্ষণ বোধ আছে, ততক্ষণ ভেদ একেবারে তিরোহিত হয় না। এই জন্য ভক্তের ভজন কখনই শেষ হয় না। কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রভাবে পরা ভক্তির নিবৃত্তি হয় না। বস্তুতঃ, জ্ঞানোত্তরই ঐ প্রকার ভক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর।

জি। বাবা, মন্ত্র ব্যতিরেকে কি যোগলাভ হইতে পারে না? লয়-যোগ, হঠ-যোগ, রাজ-যোগ প্রভৃতির ন্যায় মন্ত্র-যোগও যোগের প্রকার-ভেদ মাত্র। মন্ত্রের এত মহিমা কিসের জন্য?

ব। না গো, না—তা পারে না। মনকে ত্রাণ করিবার কৌশলকেই মন্ত্র বলে। মনের জড়তা নাশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করাই মন্ত্রের কার্য্য। যে কোন উপায়েই মনকে চেতন করিতে চেষ্টা কর, মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, ব্রহ্ম-পথ বা সুষুম্না-মার্গ না খুলিতে পারিলে কোন উপায়ই ফল দান করে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধন-জীবনে বিশ্বাস ও বিচার।

জি। বাবা, প্রকৃত বিশ্বাস কি? বিশ্বাসের স্থান সাধন-জীবনে কোথায়? কেউ বলে, বিশ্বাস করা ভাল নয়—উহাতে মনের দুর্ব্বলতা বাড়ে। বিনা পরীক্ষায় কিছু গ্রহণ করিতে নাই। আবার অন্যপক্ষে, কেহ বলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" এ বিষয়ে আপনার মত কি?

ব। বৎস, উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য। জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বিশ্বাসকে অন্ধ-বিশ্বাস বলে। প্রকৃত বিশ্বাস জ্ঞানের পরেই উৎপন্ন হয়। প্রহ্লাদের বিশ্বাস ছিল, ধ্রুবের বিশ্বাস ছিল—তাই সর্ব্বত্রই তাহারা ঘোর বিপদের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল হস্তের স্পর্শ অনুভব করিত। জ্ঞানবান্ ভিন্ন অজ্ঞানী কখনও ভগবানে প্রপন্ন হইতে পারে না—প্রপন্ন হইলে সে সর্ব্বত্রই আশ্রয়দাতার অভয় হস্ত নিরীক্ষণ করিতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণই ত ইহাই। সে সর্ব্বব্যাপক মঙ্গলময় বিরাট্ সত্তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে—তাই তাহাতেই নিজের ব্যক্তিত্ব

পরিহার করিয়া গা ঢালিয়া দেয়, বিচার-বিতর্ক করে না—করিবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। সে বুঝিতে পারে, তাহার ভিতরে-বাহিরে এক অদ্বিতীয় শক্তিরই খেলা চলিতেছে—তাই সে শুধু নয়ন ভরিয়া সেই প্রেমময়ী লীলা নিরন্তর দর্শন করিয়া ধন্য হয়। ইহাই বিশ্বাসের অবস্থা—ইহা বড় উচ্চ অবস্থা। এ অবস্থায় অসম্ভব কিছু থাকে না। কিন্তু সংশয় ভঞ্জন না হইলে প্রকৃত বিশ্বাস আসে না। মনের সংকল্প-বিকল্পই সংশয়। জ্ঞানের উদয় হইলে মনের বিকল্পবৃত্তি বিনষ্ট হয়, তখন বিশুদ্ধ সংকল্পমাত্র থাকে। বস্তুতঃ, তখন মনঃও থাকে না —কারণ, মনঃ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। মনঃ তখন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয় বা অধ্যবসায়—ইহাই সংকল্পের শুদ্ধ রূপ। এই অবস্থায় সংশয়ও থাকে না, ভ্রমও থাকে না। এই শুদ্ধ সংকল্পময় অবস্থার দুই দিক্ আছে—একটি জ্ঞানময় ও দ্বিতীয়টি ইচ্ছাময়। যে অবস্থায় সংশয় থাকে না তাহাই বিশ্বাসের অবস্থা। এই বিশ্বাসকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

জি। শাস্ত্রে আছে—"ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম-লক্ষণম্।" যাহাদের সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী তাহাদের

চিত্তে সংশয় জাগে না। সফলতার দৃঢ় ধারণা চিত্তে থাকে—তাই সফলতা জন্মে।

ব। ইহা সত্য কথা। দৃঢ় প্রতীতির নাম বিশ্বাস। ইহা কখনও ব্যর্থ হয় না। বাক্-সিদ্ধি, সংকল্প-সিদ্ধি, সব এই বিশ্বাসেরই রূপান্তর। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশ্বাস জন্মে না, বিশ্বাস ব্যতিরেকে "বস্তু মিলে" না—সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব সিদ্ধির মূল সত্যপ্রতিষ্ঠা।

জি। তবে বিশ্বাস-ঘাতকতা হয় কেন? বিশ্বাস করিয়া যে প্রতারিত হইতে হয়, নিষ্ফল হইতে হয়—তাহার কারণ কি?

ব। প্রকৃত বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সে কখনও প্রতারিত হয় না। অন্ধ-বিশ্বাস হইতেই প্রতারণা হয়। যতক্ষণ জ্ঞানোদয় না হয়, ততক্ষণ অন্ধ-বিশ্বাস থাকিবেই। জ্ঞানীর বিশ্বাস ত আর অন্ধ নহে—জ্ঞানী কখনও বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হন না। তাঁহার প্রতীতি মিথ্যা হইবার নহে। এমন কি, খেয়ালের বশেও যদি তাঁহার কোন প্রতীতি জন্মে, তাহাও সত্য হয়। মনে কর, চূণের জল দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার দুগ্ধ-স্মৃতি জাগিল—বলা বাহুল্য, ইহা ইচ্ছা নহে, তথাপি এই স্মৃতিরূপ প্রতীতিও সত্যমূলক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ উক্ত শ্বেতবর্ণ জল বস্তুতঃই তখন দুগ্ধে পরিণত হয়—দুগ্ধ

হইয়া যায়। সত্যের এমনই মহিমা যে, ইহাকে লাভ করিলে মিথ্যাও সত্য হইয়া যায়।

জি। এইখানে একটি কথা আমার জিজ্ঞাস্য আছে। যিনি যোগী, যিনি সত্যসংহিত, তাঁহার ইচ্ছা অমোঘ—উহা সফল হইবেই হইবে। সুতরাং তিনি যদি উক্ত জলকে "দুধ হউক" বলিয়া ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উহা দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু মূলে যদি সংকল্প না থাকে—শুধু প্রতীতি মাত্র থাকে, তাহা হইলে ত সৃষ্টি হওয়ার কথা নহে। আর এক কথা, জলকে তিনি জল না দেখিয়া দুগ্ধরূপে দেখিতে পাইলেন—সত্যনিষ্ঠ পুরুষের এরূপ মিথ্যা দর্শনই বা হইবে কেন? অবশ্য, অন্য লোকের পক্ষে তাহা দুগ্ধই বটে। কিন্তু এরূপ প্রতীতিতেও মিথ্যার লেশ ত রহিয়া গেল।

ব। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। যিনি যোগী বা জ্ঞানী, তিনি কখনও মিথ্যা দর্শন করেন না। সূর্য্যের নিকট যেমন মেঘের গমন-সামর্থ্য নাই, সেই প্রকার জ্ঞানীর নিকট মিথ্যার আবির্ভাব অসম্ভব। জ্ঞানী একমাত্র সত্য বস্তুই দেখেন। আত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু—জ্ঞানী সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহাই দর্শন করেন। তিনি জগতে কোথাও বহু বস্তু দেখেন না। আমরা

যাহাকে বহু বলি, আমাদের জ্ঞানে—অজ্ঞানে—যাহা নানা আকারে প্রতিভাসমান হয়, জ্ঞানীর প্রজ্ঞানেত্রে তাহা এক অদ্বিতীয় সত্তারই প্রতিভাস মাত্র। সুতরাং জ্ঞানী যুক্ত-যোগে যখন সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করেন, তখন যদি সংস্কারের উদয় হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা ঘনীভূত হইয়া আকার ধারণ করে। এই যে সংস্কারের উদয়ের কথা বলিলাম, ইহা স্বভাব হইতেই হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে, স্বভাবের বশে যখন আত্মচৈতন্যে নিহিত সংস্কার-বিশেষ উদ্‌বুদ্ধ হয়, তখনই সৃষ্টির সূচনা হয়। আত্মার উহাতে কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। ইহাকে স্বাভাবিক সৃষ্টি বলে। ইহার মূল ইচ্ছা নহে। জ্ঞানী বা যোগী যখন যুঞ্জান অবস্থায় থাকেন—ইহাও অবশ্যই যোগাবস্থা—তখন শুদ্ধ উপাধি থাকে। এই উপাধি তখন ইচ্ছারূপে আকারিত হইতে পারে। যখন তাহা হয়, অর্থাৎ যখন ইচ্ছার উদয় হয়, তখন তদনুসারিণী অর্থসৃষ্টি আপনিই হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি ইচ্ছা-মূলক।

যুক্ত জ্ঞানীর সৃষ্টি অবোধপূর্ব্বক—স্বাভাবিক। যুঞ্জান জ্ঞানীর সৃষ্টি বোধপূর্ব্বক—ইচ্ছাপূর্ব্বক—আলোচনাপূর্ব্বক। যুক্ত জ্ঞানীকে স্রষ্টা না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না—সেখানে স্বভাবই মূল। যুঞ্জান

জ্ঞানীর সৃষ্টি অভাবমূলক, ইনিই স্রষ্টা। বলা বাহুল্য, ইনি যোগী। যোগ না থাকিলে, স্বভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে, সৃষ্টি হইত না। চৈতন্যের শুদ্ধ ও ঔপাধিক দুইটি অবস্থা আছে—শুদ্ধাবস্থায় সংকল্প নাই, জ্ঞান নাই, ইহাই ব্রহ্ম-স্বরূপ। ঔপাধিক অবস্থায় বিশুদ্ধ (বিকল্পহীন) সংকল্প আছে, শুদ্ধবোধ আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে—ইহাই ঈশ্বর-স্বরূপ। অথচ ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই অভিন্ন বস্তু। বুঝাইবার জন্য ভাগ করিয়া বলা হইল মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ অবস্থা ব্রহ্ম, সক্রিয় সগুণ অবস্থা প্রকৃতি। সুতরাং ঈশ্বর ও প্রকৃতি সমানার্থক।

মহাশক্তি উভয়াত্মক হইয়াও উভয় ভাবের অতীত।

জি। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন্। সৃষ্টি-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—সময়ান্তরে জিজ্ঞাসা করিব।

ব। তুমি প্রশ্ন করিয়াছ—জ্ঞানীর মিথ্যা দর্শন হয় কেন? বস্তুতঃ ইহা অমূলক প্রশ্ন। কারণ, জ্ঞানীর মিথ্যা দর্শন হয় না। তুমি জল দেখিতেছ, পরে দেখিলে, তাহা দুগ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং তুমি যদি জলকে দুধ দেখিতে, দুধ বলিয়া মনে করিতে, প্রতীতি

করিতে, তবে তাহা মিথ্যা হইত। কারণ, তোমার নিকট জল ও দুধ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ—ভিন্ন পদার্থ। জ্ঞানী একমাত্র আত্মসত্তাই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা দেখেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে কদাপি মিথ্যা দর্শনের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট জলও যাহা, দুধও তাহাই—অর্থাৎ উভয়ই অভিন্ন-সত্তাত্মক আত্মবস্তু। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তিনি জ্ঞানী হইতেন না। জ্ঞান-চক্ষুঃ ফুটিলে যেমন সংশয় থাকে না, তেমনি ভ্রান্তি-দর্শনও থাকে না। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট পৃথক্ ভূতসৃষ্টি নাই। জলেতে বুদ্বুদের উদয়, জলে স্থিতি, জলেই লয়—সুতরাং বুদ্বুদও জলময়। যিনি জ্ঞাননেত্রে অদ্বৈত জলসত্তাই দেখিতেছেন, তাঁহার নিকট সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সমানার্থক। ব্রহ্মাকাশে সর্ব্ব পদার্থের ব্রহ্মাত্মক ভাবে নিত্যস্থিতি আছে। যুক্তাবস্থায় তিঁনি তলাইয়া যান বলিয়া তাহা দেখেন না। এইটি ব্রহ্ম-সাম্য। উপরে ভাসিলে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ থাকেন—এইটি ঈশ্বর-সাম্য। কিন্তু এ অবস্থাতেও জ্ঞান থাকে—কারণ, জীব সর্ব্বজ্ঞাবস্থাতেও ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। জ্ঞান-নেত্র খুলিলেই ঈশ্বর-সাম্য হয়—শিবত্ব জাগে। এই শিবই আত্মাশক্তি। তার পরেও অবস্থা আছে। তখন শিবত্বও বিলীন হইয়া যায়। ইহা শক্তির অন্তর্লীনাবস্থা। কোন তত্ত্বেরই

পৃথক্ সত্তা তখন উপলব্ধিগোচর হয় না। থাকেন একমাত্র তত্ত্বাতীত বস্তু,—যাহাকে স্বভাব বা পরমার্থ বলা হইয়া থাকে। তাহাই মহাশক্তি বা পরমশিব।

স্বভাবের প্রেরণায় যুক্ত-জ্ঞানীরও সংস্কার জাগিতে পরে। মনে রাখিবে, যুক্ত-জ্ঞানী, আত্ম-স্বরূপ বা চৈতন্য অভিন্নার্থক। সংস্কার জাগিলেই সৃষ্টির উদয় হয়। বস্তুতঃ, সংস্কার কথাটা ঠিক নহে। 'সৃষ্টি-বীজ' শব্দ অনেকটা পরিস্ফুট। এই বীজ জাগিলেই সৃষ্টি হয়। এই বীজ-জাগরণই চৈতন্যের প্রকৃতিরূপ গ্রহণ বা ঐশ্বর্য্য-বিকাশ।

এই বীজকে অবলম্বন করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। তাহার মূলে অভাব আছে বলিয়া ইচ্ছা আছে, জ্ঞান আছে, চেতনা বা সংজ্ঞা আছে। ইচ্ছাদির বিষয় এই বীজ। এই বীজ-সমষ্টিই জ্ঞেয় জগৎ, ইহা জ্ঞাতা হইতে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ভেদভাব অবশ্য থাকেই, নতুবা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই নামকরণই হইত না। ইহা ভেদাভেদ। ঈশ্বর-সাম্য অবস্থার বৈশিষ্ট্যই ইহাই।

যখন বিকল্পের উদয় হয়, সংশয় জাগে, তখন অভেদাংশ বিগলিত হইয়া যায়—শুধু ভেদমাত্র থাকে। ঈশ্বরপদ-ভ্রষ্ট হইয়া বদ্ধ বা খণ্ড জীবভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরভাবেও জীবভাব থাকে বটে—তাহা

শুদ্ধ ও অখণ্ড যুক্ত-জীবভাব। কারণ, অভেদের মধ্যে তখন ভেদ-দর্শনের আভাস থাকে। ঈশ্বরভাবে জীব ও ঈশ্বর পরস্পর-মিলিত, এরূপ বোধ থাকে।

খণ্ড জীবভাবে সংশয় প্রধান বৃত্তি। বক্রগতি ইহার বৈশিষ্ট্য। তির্য্যক্ বায়ু ইহার প্রাণ। ইড়া-পিঙ্গলা বা কালমার্গ ইহার সঞ্চারভূমি। এই সঞ্চারকেই শ্বাস-ক্রিয়া বলে।

এই শ্বাস বিগত হইলেই বি-শ্বাস জন্মে। শ্বাস-সাম্যের বা ইড়াপিঙ্গলা-সাম্যের সঙ্গে সঙ্গে বক্রতা দূর হয়, স্থূলতা কাটিয়া যায়, সংকল্প ও জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়, জীবভাব নির্ম্মল হইয়া ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়, স্বভাবের সঙ্গে যোগ স্থাপন হয় বলিয়া অভাব উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি হইতে থাকে।

বস্তুতঃ, ইহাই নির্ভরের অবস্থা। বিশ্বাস কি যে-সে জিনিষ? যে বস্তুতঃ বিশ্বাসী, তাহার কোন চেষ্টা থাকে না। অভাব জাগিবামাত্রই স্বভাব তাহার নিবর্ত্তন করেন। এই অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত কি ভক্তি হয়? তোমরা শুধু উন্মাদিনী ভক্তিই দেখিয়া থাক, তাই জ্ঞানকে ভয় পাও, পাছে ভক্তির স্রোতঃ তাহার তাপে (?) শুষ্ক হইয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, তোমাদের পরিচিত জ্ঞানও শুষ্ক জ্ঞানমাত্র—অন্তঃসার-বিহীন। প্রকৃত জ্ঞান কখনও নীরস নহে।

জি। আপনি বলিতেছেন—শ্বাস বিগত হইলেই বিশ্বাস জন্মে—তৎপূর্ব্বে নহে। তবে কি যাঁহারা বিশ্বাসবান্, জ্ঞানী ও ভক্ত, তাঁহাদের শ্বাস নাই?

ব। তাতে আর সন্দেহ কি? শ্বাস হইতেই সংশয়ের উদয় হয়, বিকল্প আবির্ভূত হয়, জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল রচিত হয়—কিন্তু যখন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না, বায়ু যখন সুষুম্নামধ্যে সঞ্চরণশীল হয়, তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার থাকে না, সংশয়ভঞ্জন হয়, জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হয়। ইহাই বিশ্বশক্তির হস্তে যন্ত্রবৎ হইয়া যাওয়া, স্বভাবের দ্বারা চালিত হওয়া, গুরুশক্তির অধীন হওয়া—ইহাই নির্ভর, শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদন। তখন বায়ু সুষুম্নার মধ্যে সঞ্চরণ করে—রেচক ও পূরক, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুর আদান-প্রদান নিবৃত্ত হইয়া যায়। অজপা-রহস্যের আলোচনাকালে ভবিষ্যতে এ-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব।

বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেই বিকল্প ও সংশয়ের উদয় হয়। এই সম্বন্ধ বায়ু-ঘটিত। সুতরাং বাহ্য বা স্থূল বায়ুর আকর্ষণ বন্ধ হইয়া গেলেই সংশয় কাটিয়া যায়। সূক্ষ্ম বায়ুর ক্রিয়া সুষুম্না মধ্যে তখনও হইতে থাকে বটে—কিন্তু ঐ ক্রিয়া স্বভাবতঃই সরল পথে হয় বলিয়া উহা জ্ঞানের প্রকাশক হয়, আবরক হয় না। বিশ্বাসের গাঢ়তম অবস্থায় আন্তর

শ্বাসও থাকে না—সেটা প্রাপ্তির অবস্থা। তখন সঙ্কল্পও থাকে না। বিশ্বাস ও নির্ব্বিকল্প দশা প্রায় সমান। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা।

জি। আপনার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি—'সহসা কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, করিলেই ঠকিতে হইবে।' ইহাও কি যথার্থ মত?

ব। ইহাও অবশ্যই সত্য। যাহার জ্ঞানোদয় হয় নাই, যাহার বিশ্বাস অন্ধ, সে ত মায়িক ব্যাপারে মোহিত হইবেই। সে ত প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতারিত হইতেছে। সে ত নিজেই নিজেকে প্রতারিত করিতেছে—অন্যে যে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহার পক্ষে বিচার আবশ্যক। আসল কথা এই—জ্ঞানলাভ না হইলে চিত্ত মলিন থাকে, চিত্তে প্রতারণা-বীজ নিহিত থাকে, তাই জগতের সর্ব্বত্রই সে প্রতারিত হয়। অজ্ঞানীকে সকলেই বঞ্চনা করে—তাহার নিজের মনঃ, নিজের ইন্দ্রিয়, কেহই তাহাকে সত্যের সন্ধান দেয় না। সকলেই তাহার সঙ্গে রিপুবৎ ব্যবহার করে। কিন্তু এই মনঃ ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানীকে বঞ্চনা করিতে পারে না, করে না—অর্থাৎ যে জ্ঞানী, সে ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু অনুভব করে তাহা ব্রহ্মময়, মনঃ দ্বারা যাহা বোধে আনে তাহাও ব্রহ্মাত্মক। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা তাহার ব্রহ্মসত্তারই অনুভব

হইয়া থাকে। তাহার কাছে মিথ্যার আবির্ভাব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি—কোন অবস্থাতেই তাহার ব্রহ্মদর্শন খণ্ডিত হয় না।

অতএব, সাধারণ লোকের পক্ষে অবিচারিতভাবে কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। বিচারে ভ্রান্তি আসিবার সম্ভাবনা থাকিলেও বিচার অপরিহার্য্য। অবশ্য সদ্বিচার করিবে—কুতর্ক করিবে না। কুতর্ককে বিচার বলে না।

আজকাল অন্ধবিশ্বাসের প্রবলতা বড় বেশী দেখিতে পাই। অন্ধবিশ্বাসও কুতর্কের ন্যায় সর্ব্বথা পরিহার্য্য। অন্ধবিশ্বাস করিয়া কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যা-তা বিশ্বাস করিবে কেন? পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিও না। তোমার নিকট সত্যনির্ণয়ের যে সকল পরীক্ষা-সাধন আছে, সব প্রয়োগ করিয়া দেখ—তবে মানিতে প্রবৃত্ত হও। চিলে কান লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া চিলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোন ফল নাই। আগে হাত লাগাইয়া স্পর্শ দ্বারা জান, তোমার কান আছে, কি গিয়াছে—যদি না থাকে, তখন বিচার কর, ঐ স্থানে ও ঐ সময়ে চিল আসিবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি থাকে, তবে সন্ধান লও, সত্যই চিলকে আসিতে কেহ দেখিয়াছে কি না। যদি দেখিয়া

থাকে, তখন সন্ধান লও, তোমার কান চিলে লওয়া কাহারও প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে শুধু শোনা কথার বিশেষ মূল্য নাই। যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তবে সে লোকটি আপ্ত কি-না—অন্ততঃ তাহার বিরুদ্ধে কিছু ভাবিবার আছে কি-না, তাহা নিরূপণ কর। এতটা বিচার করিলে তবে বিশ্বাস করিতে পার। কিন্তু এত করিয়াও তোমার প্রকৃত বিশ্বাস হইবে না, সম্ভাবনা-বুদ্ধির উপরে তুমি উঠিতে পারিবে না। ব্যবহার-জগতে এই পর্য্যন্তই সম্ভবপর ও আবশ্যক। এতটার পরে এই যে বিশ্বাস, ইহাও কিন্তু মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু হইলেও লৌকিক দৃষ্টিতে তোমার খেদ করিবার হেতু নাই। কারণ, যতটা পরীক্ষা করিতে পারা যায়, ততটা করিয়া তবে তুমি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলে। এই প্রকার বিশ্বাস না করিলে ব্যবহার কঠিন হইয়া পড়ে। এই বিশ্বাস যদিও প্রকৃত বিশ্বাস নহে,—কারণ ইহা জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সঞ্জাত,—তথাপি ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে। কারণ, ইহার পূর্ব্বে বিচার রহিয়াছে। মূলতঃ ইহাও প্রত্যক্ষের উপরে স্থাপিত। অন্ধবিশ্বাসে মনঃ নিস্তেজঃ হইয়া যায়। যুক্তি ও বিচার হইতে পরাঙ্মুখ হওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। প্রকৃত বিশ্বাস আসিলে যুক্তি নিষ্প্রভ হইয়া

পড়ে—তাহার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসের পূর্ব্বে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, সদ্বিচার ও সদ্‌যুক্তির আবশ্যকতা আছেই।

জি। যাহা অসম্ভব, তাহা বিশ্বাস করা কি অন্ধবিশ্বাস নহে? অনেকে বিনা দ্বিধাতে অনেক অনেক অসম্ভব বিষয়ও মানিয়া থাকেন। ইহা কি অন্ধ-বিশ্বাসের নিদর্শন নহে?

ব। কোন্‌টা সম্ভব, আর কোন্‌টা অসম্ভব—তাহার কোন মানদণ্ড আছে কি? সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্—সব জিনিষেই সব জিনিষ আছে, সবই সর্ব্বময়। শুধু তাহাই নয়—আত্মাতে বিশ্ব আছে, বিশ্বে আত্মা আছেন—যে দেখিতে জানে, সে দেখিতে পারে। যে শক্তিশালী ও তত্ত্বজ্ঞ, সে জানে কিছুই অসম্ভব নহে। জ্ঞানের আবরণ খসিয়া গেলে অচিন্ত্য শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে—দেখিবে, তুমি এখন যাহা চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছ না, তাহাও সম্ভবপর, ঐ অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী শক্তির প্রভাবে তাহাও সংঘটিত হইতে পারে—অনেক স্থলে হইয়াও থাকে। এই জন্য —"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ", অচিন্ত্য ভাব সম্বন্ধে বৃথা তর্ক করিবে না। যিনি ক্ষমতাশালী, যিনি ব্রহ্মবিৎ যোগী, যিনি প্রকৃতির রহস্যজ্ঞ, যিনি মায়াধীশের অনুগ্রহে মায়াকে অতিক্রম

করিয়াছেন ও মায়াকে চালনা করিতে সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তিনি কি না পারেন? ঈশ্বর-সাম্য লাভ করিয়া যে যোগী যোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারেন যে, বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। যাহার যতটুকু ক্রিয়াশক্তি, সে ততটুকুই সম্পাদন করিতে পারে, যাহার জ্ঞানশক্তি যতটা বিকশিত, সে ততটাই ধারণা করিতে পারে—তাহার বেশী পারে না। এক জনে যাহা পারে না, আর এক জনে শক্তির আধিক্য-বশতঃ তাহা পারে, অন্য এক জনে তদপেক্ষা অধিক পারে। শক্তির আবরণ যতই অপগত হইতে থাকে, ততই সম্ভাবনার রাজ্যের প্রসার বাড়িয়া যায়। যখন শক্তি অনাবৃত ও মুক্তাবস্থা লাভ করে, তখন সবই সম্ভবপর হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ যোগী মহাশক্তির কৃপায় কিছুই অসম্ভব দেখেন না।

বস্তুতঃ এ জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই—অথচ সবই আশ্চর্য্য। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি কিছুতেই আশ্চর্য্য হন না, কারণ তিনি এমন বস্তুর উপলব্ধি করিয়াছেন, যেখানে যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমন্বয় হইয়াছে, যেখান হইতে সর্ব্বভাবের সম্ভব হইতেছে—তিনি দেখেন, সবই হইতে পারে। সর্ব্বত্র

যখন সর্ব্ববিধ সত্তা অনুস্যূত রহিয়াছে এবং পরম সত্তা যখন অখণ্ডভাবে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তখন না হইতে পারে এমন কি আছে? দেশ, কাল ও নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিতে পারে না। যে-স্থানে যে-ভাবের অভিব্যঞ্জক সামগ্রী আছে, সেখানে সেই ভাবই প্রকটিত হয়—বাকী সব অব্যক্ত থাকে। কিন্তু অব্যক্ত থাকিলেই সব ভাবেরই সত্তা আছে—প্রতিবন্ধকতা বশতঃ শুধু তাহাদের অভিব্যক্তি হইতেছে না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অথবা বিজ্ঞান-কৌশলে প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারিলে যে-কোন স্থানে যে-কোন ভাবের প্রকাশ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে লক্ষ লক্ষ বার ত আমি সহস্র প্রকারে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছি। যে-ভাব প্রবল হয়, তাহাই অন্যান্য ভাবকে অভিভূত করিয়া ফুটিয়া উঠে—জগতের লোকে সেই অভিব্যক্ত ভাবটিকেই একটি বিশিষ্ট বস্তুরূপে দেখিতে পায়। কিন্তু যে জ্ঞানী, তাঁহার জ্ঞান-নেত্রে অব্যক্ত ভাবও গোচর হইয়া থাকে। ইচ্ছা করিলেই যে-কোন অব্যক্ত ভাবকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই যে অব্যক্ত ভাবের কথা বলিলাম—ইহাই বীজ। তাই জ্ঞানী কিছুতেই আশ্চর্য্য হন না—তাঁহার নিকট প্রকৃতির সব চালাকী ধরা পড়িয়া যায়, ফাঁকি চলে

না। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার যে কৌশলের উপরে চলিতেছে, তাহা তিনি জানেন। তাই তিনি কিছুতেই মোহিত হন না—সর্ব্বদাই স্বরূপস্থ থাকেন। ইন্দ্রজালে মোহিত হওয়া বা আত্মস্বরূপকে দেখিতে না পাওয়াই আত্মবিস্মৃতির প্রধান নিদর্শন। জ্ঞানী বা যোগী তাই উদাসীন, সমদৃষ্টি, নির্লেপ ও নিরঞ্জন। এই গেল এক পক্ষের কথা।

পক্ষান্তরে যিনি জ্ঞানী বা যোগী, তিনি দেখেন, এ জগতের সবই আশ্চর্য্য। একটি ধূলি-কণার মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা তিনি দেখিতে পান। এই যে পরিচিত জগৎ, যাহা অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, তাহা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপূর্ব্ব। তিনি সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তির খেলাই দেখিতে পান, দেখিয়া বিস্মিত হন। সেই পরম মহানের মহত্ত্ব তিনি ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যেও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন—একবিন্দু বীর্য্য হইতে এই সুন্দর অপূর্ব্ব চমৎকারশালী দেহ উদ্ভূত হয়, একটি বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হয়। একটি ক্ষুদ্র ফলে বা পুষ্পে যে সৃষ্টিকৌশল লক্ষিত হয়, সূক্ষ্মদর্শী ও ধীরপ্রকৃতি তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হন। এই জগতের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে

মহাপ্রলয়ের সূচনা হয়, একটি মাত্র ক্ষণের দৃষ্টিপাত হইতে চির-জীবনের সত্য স্থাপিত হয়—আশ্চর্য্য কোন্‌টি নয়? যাহাকে ঘোর বিপদ মনে করিতেছ, দেখিবে, তাহাতেও পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। জ্ঞান-নেত্রে যাহা দেখিবে, যাহা কিছু ভাবিবে—সর্ব্বত্রই অদ্ভুত দেখিবে। কোথাও বিস্ময়ের অন্ত পাইবে না। অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা দর্শন করিয়া ধন্য হইবে, কৃত-কৃত্য হইবে, হৃদয়ে পরম ভাবের উদয় হইবে। জ্ঞানী ভিন্ন কাহারও পক্ষে বিশ্বরূপ-দর্শন, বিশ্ব-নাট্যের অভিনয় দর্শন, সম্ভবপর নহে।

অতএব আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কোথাও না থাকিলেও সর্ব্ব বস্তুই পরমাশ্চর্য্যময়। যাহা অতি কঠিন, তাহাই অতি সরল ও সহজ; যাহা দূরে—অতি দূরে, তাহাই অতি সমীপস্থ—একেবারে নিজের অঙ্কগত—ইহার চেয়ে আর আশ্চর্য্য কি আছে? একটি ক্ষণের মধ্যে—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে—সমগ্র অতীত ও অনাগত কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু খেলা করিতেছে। যাহা ছোট, তাহাও বড় দেখায়, যাহা বড়, তাহাও ছোট দেখায়—যে জন্য এরূপ হইয়া থাকে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলে জানা যায় যে, কিছুই অসম্ভব নাই, জানা যায় যে, যাহা "অণোরণীয়ান্" তাহাই আবার

"মহতো মহীয়ান্"—অথচ স্বরূপতঃ তাহা অণুও নহে, মহৎও নহে।

জি। তবে ত 'অন্ধবিশ্বাস' কথাটাই ভুল বলিতে হইবে। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে যখন অসম্ভব কিছুই নাই, তখন আর বিচারের আবশ্যকতা কি? সবই ত বিশ্বাসযোগ্য—অবিশ্বাসযোগ্য কিছুই নাই।

ব। যে সত্য সত্যই ধারণা করিতে পারে যে, সবই সম্ভবপর, যে সত্যই ভূয়োভূয়ঃ অচিন্ত্য ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও করিতেছে, যে প্রাকৃতিক শক্তির বৈচিত্র্য ও মহিমা জানে, তাহার পক্ষে উহাতে বিশ্বাস করা অন্ধবিশ্বাস নহে—না করাই মূর্খতা। ব্যোমযানে শূন্যপথে যাওয়া যায়, এখন বহু লোক ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। যদি কোন লোক তাহা না মানিতে চায়—তাহাকে নানা প্রকারে বুঝান ও প্রত্যক্ষ দেখান আবশ্যক। তবু যদি সে বিশ্বাস না করে, তবে তাহার মূর্খতা। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত। আর যে কখনও ব্যোমযান দর্শন করে নাই, যাহার পক্ষে তাহা করিবার সম্ভাবনাও নাই, যাহার ভাগ্যে এমন কোন আপ্ত পুরুষ মিলে নাই—যে উহা দেখিয়া তাহার নিকট উহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, প্রত্যুত যে এইরূপ ব্যাপার কৌশলমূলক বলিয়া বহুবার অনুভব করিয়াছে—

তাহার পক্ষে যার-তার কাছে ব্যোমযানে শূন্যে গমনের কথা শুনিয়া উহাতে আস্থা স্থাপন করা নিশ্চয়ই অন্ধবিশ্বাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। ব্যোমযানে শূন্যপথে যাত্রা সত্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় তাহাতে বিশ্বাস করা অযৌক্তিক ও বিচারহীনতার পরিচায়ক। অন্ধবিশ্বাসে সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কোন কিছু শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিচার করিবে, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিবে, প্রত্যক্ষেও ভ্রান্তি হইতে পারে বলিয়া যথাসম্ভব ভ্রান্তির কারণ দূরীভূত করিবে, পুনঃপুনঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে, অন্যের অনুভূতির সঙ্গে সম্ভবপর হইলে তুলনা করিবে, ব্যবহার ক্ষেত্রের মানদণ্ড দ্বারা দর্শনের তথ্যতা বা বিতথতা নির্ণয় করিবে, উহার অর্থক্রিয়াকারিতা নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে—তবে ত বিশ্বাস স্থাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এক কথা। অন্ধবিশ্বাস যেমন খারাপ, তেমনি অসম্ভব বলিয়া পরিহাস করাও অসঙ্গত। কারণ, প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যরেখা এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যাহা এক সময়ে সকলেই অসম্ভব মনে করিয়াছে, কালান্তরে তাহা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই কথাটি মনে রাখিলে

আত্মাভিমানের দৃপ্ততা কাটিয়া যাইবে, চিত্তে নম্রতা আসিবে। কিছু শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করা যেমন সাধারণ লোকের পক্ষে অনুচিত, তেমনই তাহা অসম্ভব বলিয়া তৎক্ষণাৎ বিনা বিচারে ও বিনা সম্যক্ অনুসন্ধানে পরিহার করা ততোধিক অনুচিত। যাহা সত্য, তাহাকে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেই সে উড়িয়া যায় না। তাহাতে শুধু নিজেরই অদূর-দর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়।

জি। এবার আমার অনেক সংশয় দূর হইয়াছে। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। মনুষ্যকে ঈশ্বর মনে করা, পাথরকে চেতন মনে করা—এরূপ বিশ্বাসের সমর্থন হয় কি?

ব। যাহার প্রকৃত বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। কেন না, তাহার পক্ষে সবই সম্ভবপর। বিশ্বাসের বলে না হইতে পারে, এমন কি আছে? বিশ্বাসের প্রভাবে মনুষ্যে ঈশ্বরত্বের বিকাশ হইতে পারে অথবা মনুষ্য-নিহিত অব্যক্ত ঐশ্বর্য্যও উপলব্ধ হইতে পারে। পাথরও চেতন—কারণ চৈতন্য সর্ব্বগত, তবে আধার মলিন বলিয়া তাহা স্ফুটভাবে প্রকাশিত হয় না। সেই জন্য পাথরকে জড় বলিয়া বোধ হয়। যে বিশ্বাসী, সে পাথরকে চেতন মনে করিলে ঐ অব্যক্ত চৈতন্য আধার বিশুদ্ধ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠে, তখন ঐ পাথর চেতনের ন্যায় ব্যবহার করে,—চলিতে পারে, কথা বলিতে পারে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে সত্যসন্ধ ও বিশ্বাসী—অর্থাৎ যে যোগী, জ্ঞানী বা ভক্ত, তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই।

কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সাধারণ অবস্থায় মনুষ্যে ঈশ্বরবোধ, শিলায় দেববোধ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে অবশ্য ভাবনা করার উপদেশ আছে বটে, কিন্তু তাহার রহস্য আছে। উপাদান সংগ্রহ না করিয়া শুধু ভাবনা দ্বারা কোন ফল লাভ হইতে পারে না। এই গোলাপ ফুলটি আমি ভাবনা-বলে এই মুহূর্ত্তে ইচ্ছানুরূপ অতি কঠিন প্রস্তরখণ্ডে অথবা অন্য কোন পদার্থে বা জীবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না। কারণ, তোমাদের ভাবনা-সিদ্ধি হয় নাই—তোমরা এখনও উপাদান সংগ্রহ করিতে পার নাই। সত্ত্বশুদ্ধিপূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ না করিতে পারিলে সঙ্কল্প কখনও সিদ্ধ হয় না, বিকল্পের পরিহার হয় না, একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। ভাবনাই ত কল্পনা। জীব-ভাবের কল্পনা দ্বারা ব্যাবহারিক সত্তার অভিব্যক্তি হয় না, ঐশ্বরিক কল্পনা দ্বারা হইতে পারে। ঈশ্বরের কল্পনা সত্যমূলক—তাই তিনি সৃষ্টি প্রভৃতি করিতে

পারেন। জীব ঐশ্বর্য্যলাভ না করা পর্য্যন্ত তাহা পারে না। মনুষ্যমাত্রে ঈশ্বরভাব, শিলাদিমাত্রে দেবভাব ইত্যাদি জ্ঞানী উপাসকের লক্ষণ। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ন্যাস—যাহাদের ইহা হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভবপর হয় না। অজ্ঞানীর ভাবনা ও জ্ঞানীর ভাবনায় অনেক ব্যবধান। সচরাচর উপাসনার বিষয়ে যে সকল আলোচনা হয়, তাহা অজ্ঞানীর উপাসনা। বস্তুতঃ ঐ সকল স্থলে ভাবনা প্রাতিভাসিক সত্তার ঊর্দ্ধে অন্য কিছু প্রকটিত করিতে পারে না। জ্ঞানীর ভাবনাই প্রকৃত উপাসনা—তাহাতে ব্যাবহারিক সত্তা পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয়। পারমার্থিক সত্তা ত নিত্যসিদ্ধ অদ্বয়-ব্রহ্মসত্তা বা আত্মস্বরূপ,—তাহা ত ভিত্তিরূপে বোধ-ভূমিতে থাকিবেই। বিকল্প ত্যক্ত হইলে, পরিশেষে সংকল্পও পরিত্যক্ত হইলে, প্রতিভাস ও ব্যবহারের অধিষ্ঠানভূত, সর্ব্বত্র-ব্যাপক অখণ্ড চিৎসত্তারূপিণী পরমানন্দময়ী অথচ আনন্দাতিগা মহাশক্তি প্রকটিত হন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বরূপোপলব্ধির পথে—পূর্ব্বস্মৃতি।

জিজ্ঞাসু। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। ঋষি ও আচার্য্যগণের মতভেদ দেখিয়া আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের বিচার-মোহ উপস্থিত হয়। আপনি এ-সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য বাকী রহিয়াছে। কেহ বলেন, জীব ব্রহ্মস্বরূপ ও চিন্ময়, কিন্তু অনাদি মায়ায় আত্মবিস্মৃত আছে বলিয়া নিজেকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পারিতেছে না। অভেদ-জ্ঞানের উদয় হইলে যখন মায়ার নিবৃত্তি হইবে, তখন নিজেকে নিজে চিনিতে পারিবে। তারপর সকল বৃত্তির উপশম হইয়া ব্রহ্মরূপে স্থিতি হইবে। কেহ বলেন জীব পুরুষোত্তম বা পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি—ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ বিধৃত রহিয়াছে। কাহারও মতে চিৎশক্তিরূপ জীব এবং অচিৎশক্তিরূপ গুণময়ী প্রকৃতি ঈশ্বরের অঙ্গস্বরূপ ও নিত্য। প্রকৃতির আবেশবশতঃ জীবের বন্ধন হয়, কিন্তু উহা কাটিয়া গেলেও জীবের নিত্য সত্তা

বাধিত হয় না। আবার কাহারও মতে পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তিকেই জীব বলে। তাঁর স্বরূপ শক্তি যেমন তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া তাঁহা হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ তাঁহার তটস্থশক্তি বা জীব তাঁহা হইতে একভাবে অভিন্ন হইলেও প্রকারান্তরে ভিন্ন। এইপ্রকার আরও অসংখ্য প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত জীবের নিত্যতা এবং সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধেও নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমার প্রশ্ন এই—গুরুকরণের পরে সাধনমার্গ-প্রাপ্ত হইয়া জীব যখন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, তখন সে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কি উপলব্ধি করিতে থাকে?

বক্তা। বৎস, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বীরের ন্যায় একনিষ্ঠা ও ধৈর্য্যসহকারে সাধন করিয়া যাও, কালপূর্ণ হইলে সব তত্ত্ব নিজেই বুঝিতে পারিবে। নিজের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রের বিভিন্ন মত শুনিয়া সত্য-নির্ণয় করিতে পারিবে না। শাস্ত্রকারগণ এক এক জন এক এক ভাবে এক এক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন—তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে। তবে পূর্ণ সত্যের রূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারিবে না। জীব যে নিত্য এবং ভগবদাশ্রিত চিন্ময়

তত্ত্ববিশেষ, একথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু প্রকারান্তরে জীবভাবকে অনিত্য ও মায়াকল্পিত যে না বলা যায়, তাহা নহে। সুতরাং শুধু শব্দবিন্যাসের বৈচিত্র্য হইতে বাস্তবিক সত্যাসত্যের নিরূপণ হয় না। কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের বিকাশ হইলে কিছুই জানিবার বাকী থাকিবে না। সুতরাং, আলস্য ত্যাগ করিয়া অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা কর—নিজেই সব বুঝিতে পারিবে। জ্ঞানের উদয় হইলে জীবের আবরণ যখন একটু একটু করিয়া কাটিতে থাকে, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ-পথে জাগিয়া উঠে। সে তখন নিজেকে চিনিতে পারে, এবং জগৎকেও চিনিতে পারে। কোন্ বস্তু নিত্য ও কোন্ বস্তু অনিত্য, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়।

জি। এই যে আত্মবোধের আবরণ, তাহা কাটিবার কি কোনও ক্রম আছে ?

ব। আছে বই কি ? প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগে, কর্ম্ম ও সংস্কার সকল প্রত্যক্ষ হয়। জীব কবে কোথায় ছিল, কি কর্ম্ম কখন করিয়াছে, তাহার ফলে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কোন্ সময়ের কোন্ কর্ম্ম হইতে কবে কোন্ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াছে —সব স্মরণ করিতে পারে। কাহার সহিত কখন কি সম্বন্ধ ছিল, সব তার মনে পড়িতে থাকে। দেখ,

জ্ঞান, কর্ম্ম, অনুভূতি, সুখদুঃখভোগ, যাহা কিছু আমাদের ঘটিতেছে, কিছুই লুপ্ত হয় না—লিঙ্গদেহে সবই সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। স্থূলদেহের পরিবর্ত্তন হয় বটে—কিন্তু লিঙ্গদেহ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সৃষ্টির আদিতে লিঙ্গদেহের বিকাশ হইয়াছে —জন্ম-জন্মান্তর সেই একই লিঙ্গদেহ কর্ম্মানুরূপ পৃথক্ পৃথক্ স্থূলকোষে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বাসনা, সংস্কার প্রভৃতি এই লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। যখন জ্ঞানের আভাস লিঙ্গে জাগে, তখন সেই আলোকে লিঙ্গস্থ সংস্কার-রাজি চলচ্চিত্রের ন্যায় সজীব হইয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হয়। অবশ্য প্রথমে স্মৃতিরূপে বোধ জাগে, পরে তাহা প্রত্যভিজ্ঞার আকার ধারণ করে। যেমন একটি সূত্রে সহস্র মণি গ্রথিত থাকে, তেমনি একই লিঙ্গাত্মায় সহস্র সহস্র জন্মের সংস্কার আহিত থাকে।

জি। সাধারণতঃ লোকের পূর্ব্ব-সংস্কার জাগে না কেন? দুই একজনের জাতিস্মরতার বিষয় অবশ্য শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা বাদ দিলে সাধারণতঃ জীবের পূর্ব্ব-স্মৃতি থাকে না কেন? সাধনা দ্বারা স্মৃতি যখন অবশ্যই জাগে, তখন জন্মান্তর-তত্ত্ব যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কোন কোন ধর্ম্মে তাহা অঙ্গীকৃত হয় নাই কেন?

ব। বৎস, লিঙ্গে সংস্কার থাকিলেও যতক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত না হয়, ততক্ষণ তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তবে বলিতে পার, স্মরণ হইতে বাধা কি? বলিতে পার—"বর্ত্তমান জন্মের অতি প্রাচীন ঘটনাও ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়, উপযুক্ত উদ্দীপক কারণ পাইলে জাগিয়া উঠে। অবশ্য কোন কোন সংস্কার এত অভিভূত হইয়া থাকে যে, তাহাকে জাগান কঠিন হয়, তথাপি বর্ত্তমান জন্মের স্মৃতি যে মানুষের জাগে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিতে বাধা কি? সব স্মৃতি না জাগিতে পারে, বহু স্মৃতি ত জাগিতে পারে।" ইহার রহস্য আমি বুঝাইয়া দিতেছি। দেখ, লিঙ্গ যদিও এক বটে, তথাপি তাহা স্থূলের সঙ্গে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া থাকে যে, তাহা স্থূলের অংশ না লইয়া থাকিতে পারে না। লিঙ্গ স্থূলাশ্রয় ভিন্ন কোন প্রকার কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ নহে। এমন কি, মৃত্যুর পরেও স্থূলাভাস তাহাতে লাগিয়া থাকে—ইহাকেই কর্ম্মাশয় বলে। চিত্তের শোধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূল হইতে লিঙ্গকে বিবিক্ত করা যায় না। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সব লিঙ্গেরই বৃত্তি-অনুযায়ী নাম মাত্র। এই সকল বৃত্তিও স্থূলসাপেক্ষ। এমন কি, ইন্দ্রিয়গুলিও স্থূলদেহকে

আশ্রয় না করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। তবে স্থূলের তারতম্য আছে, ইহা সত্য। এখানে স্থূলদেহ যে প্রকার, ভুবর্লোক বা স্বর্লোকের স্থূলদেহ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। কিন্তু সকল প্রকার ভেদ সত্ত্বেও স্থূলদেহের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা সর্ব্বত্রই আছে। ব্রহ্মালোক হইতে অধস্তন লোক পর্য্যন্ত সবই পঞ্চীকৃত ভূতে নির্ম্মিত। লিঙ্গ যে লোকেই থাকুক, স্থূলকে আশ্রয় করিয়াই তাহার ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান, অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি লিঙ্গস্থিত যাবতীয় ভাবই আত্মপ্রকাশের জন্য স্থূলদেহের উপর নির্ভর করে। নিরাকারে লিঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও অসংকল্প—সুতরাং জ্ঞানাদি কিছুই নাই। স্থূলাকার: মাত্রেরই প্রাকট্য পঞ্চীকরণ-সাধ্য। এখন কথা এই—যে স্থূলদেহ বা আকার অবলম্বন করিয়া লিঙ্গ যখন কার্য্য করে, সেই স্থূলদেহের একটা ছাঁচ তখন লিঙ্গে পতিত হয়, লিঙ্গ তদ্ভাবে ভাবিত হয়। স্থূলদেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গের এই মৌলিক ভাবনাও পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সহিত অজ্ঞানজনিত লিঙ্গের অধ্যাসই ইহার একমাত্র হেতু। অতএব যত দিন অজ্ঞান আছে, তত দিন সত্য সত্য লিঙ্গের অভিন্নতা সত্ত্বেও আকার-ভেদবশতঃ একটি কল্পিত ভেদ থাকে। জলের বা বায়ুর আকার না থাকিলেও

পাত্র-ভেদে তাহার আকার হয় ও তাহা ভিন্ন ভিন্ন হয়। তদ্রূপ লিঙ্গ—বিশুদ্ধ লিঙ্গ—আত্মা বা চৈতন্যের ন্যায় নিরাকার হইলেও স্থূল সম্বন্ধ যতদিন আছে, ততদিন তাহার আকার আছে এবং সে আকারের বৈশিষ্ট্যও আছে। লিঙ্গ যে এক, এটা এখন তোমার শোনা কথা। যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, তখন ইহাতে যে যে আকার আরোপিত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সহিত যে যে স্থূলদেহের সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষ করিবে। লিঙ্গ নিরাকার হইলেও পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ইহাতে নির্লিপ্তভাবে সহস্র সহস্র আকার প্রতিভাত হইবে। এক সূত্রে যেমন বহু-সংখ্যক মণি ও এক শক্তিতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত—তদ্বৎ এক লিঙ্গে বহু আকার প্রতিবিম্বিত বলিয়া বোধ হইবে। এখন দেহাধ্যাস আছে বলিয়া লিঙ্গ ও দেহ জড়িত হইয়া মাখামাখি হইয়া আছে। এই অবস্থায় যত দেহ, কার্য্যতঃ তত লিঙ্গ। লিঙ্গকে দেহ হইতে পৃথক্ করিতে পারিলেই লিঙ্গে অভিন্নতা প্রতিভাত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দেহাভাস তাহাতে ফুটিয়া উঠে। বিশ্বরূপ দর্শনে যেমন "তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা" দেখা যায়, এও সেই প্রকার একটি লিঙ্গের মধ্যেই নিজের সমস্ত ধারাটি—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে কোটি কোটি জন্ম, অসংখ্য

আকার, সমস্ত বৈচিত্র্য, অনুভূত হয়। এসব আকার যে আমারই আকার, তাহা তখন প্রথমে অস্ফুট স্মৃতিরূপে, পরে পরিস্ফুট প্রত্যভিজ্ঞারূপে, উদ্বুদ্ধ হয়। পরে আকার মিলাইয়া গেলেই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

যতদিন অজ্ঞান থাকে, ততদিন স্থূলের সহিত লিঙ্গের তাদাত্ম্যবশতঃ লিঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ থাকে। সেই জন্য এক স্থূলদেহের অনুভূতি সেই দেহাশ্রিত ও সেই দেহের আকারে আকারিত লিঙ্গ ভিন্ন অন্যাকার-যুক্ত লিঙ্গে প্রকাশিত হয় না। সংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। আমাদের আত্মবোধ স্থূলদেহাবলম্বনেই প্রকাশিত হয়। এই জন্য ইহা সর্ব্বদাই খণ্ডিত হইয়া জাগিতেছে। খদ্যোতের অঙ্গজ্যোতিঃ যেমন একবার জ্বলে, একবার নিভে, আমাদের দেহাশ্রিত আত্মবোধও সেইপ্রকার কখনও জাগে, কখনও নিবৃত্ত হয়—সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে না। বলা বাহুল্য, থাকিতে পারেও না। স্থূলবায়ুর ক্রিয়া—শ্বাসপ্রশ্বাস—হইতে এরূপ হইয়া থাকে। ইহাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে। মৃত্যুকালে সাধারণ জীব মাত্রেরই এই আত্মবোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেখানেই জাগরণ সমাপ্ত হয়, মহানিদ্রার সূত্রপাত হয়। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা সব স্বপ্নবৎ, মূর্চ্ছিতবৎ, মূঢ়বৎ। পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে

স্থূলবায়ুর প্রভাব থাকে না বলিয়া জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। জীব মাতৃগর্ভে লিঙ্গের অভিন্নতা প্রত্যক্ষ করে বলিয়া সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। তখন দেহাধ্যাস থাকে না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই বাহ্য বা স্থূলবায়ুর ক্রিয়া হয়, বিস্মৃতি আসে, বিক্ষিপ্ত ভাবের উদয় হয়, একাগ্রতা কাটিয়া যায়, খণ্ড আত্মবোধ বিচ্ছিন্নভাবে জাগে। এই প্রকারে কত জন্ম কাটিয়া যাইতেছে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। সাধারণ মনুষ্য মৃত্যুর সময় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়। জ্ঞানের উদয় নাই বলিয়া মনুষ্য ত অজ্ঞান-মধ্যেই থাকে—তবে যতদিন বিক্ষিপ্তভাবে থাকে, ততদিন শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে, বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া থাকে, খণ্ডিত বা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান থাকে। ইহা অজ্ঞান-মূলক বিক্ষেপ। মৃত্যুকালে বাহ্য বায়ুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, প্রাণাপানের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয়, অজ্ঞান-মূলক লয় আসিয়া জীবকে অভিভূত করে। এই আবরণই মৃত্যু। তখন জীবচৈতন্য তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কিন্তু যে জ্ঞানী, তাহার মৃত্যু হয় না। অর্থাৎ সে আত্মবিষয়ক অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান লাভ করিয়াছে বলিয়া মৃত্যুকালে অভিভূত হয় না, বোধ হারায় না। মৃত্যু কি? না, দেহ স্খলিত হওয়া, লিঙ্গ ও স্থূলের পৃথক্‌তা

হওয়া। জ্ঞানীর যখন তাহা হয়, তখন সে তাহা দেখিতে থাকে। অজ্ঞানীর মৃত্যু এক প্রকার ক্লোরোফর্ম্মের অবস্থা। আর যে জ্ঞানী ও যোগী, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করে। দেহত্যাগের সময় তাহার জ্ঞান ত থাকেই—বিশেষতঃ উহা তাহার ইচ্ছামূলক।

সুতরাং অজ্ঞানী লোক যখন জন্মান্তর লাভ করে, তখন নবদেহের সঙ্গে লিঙ্গে নবাকার জড়িতভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না। নিদ্রাতে পূর্ব্বস্মৃতি যায় না—কারণ স্থূলদেহ অভিন্ন থাকে বলিয়া লিঙ্গের মৌলিক আকার অখণ্ডিত থাকে। যদিও মৃত্যুও একজাতীয় নিদ্রা বটে, তথাপি ঐ সময় স্থূল দেহের ত্যাগ ও নবীন দেহের গ্রহণ হইয়া যায় বলিয়া পরে নূতন দেহে প্রাচীন দেহের কর্ম্মের স্মৃতি থাকে না।

তবে যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা কর্ম্মবিশেষের ক্ষয়ের জন্য অথবা অন্যকারণে স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা জন্ম হইতেই স্মৃতিশালী থাকেন। তাঁহারা জাতিস্মর হন। তবুও স্থূলদেহে অবিদ্যার প্রভাব এত বেশী যে, জ্ঞানের প্রবলতা না থাকিলে শীঘ্রই বিস্মৃতি আসিবার সম্ভাবনা আছে। উর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া—অবতীর্ণ হইয়া—যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট জ্ঞানী বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি রাখিতে পারেন। তবে যদি তাঁহারা ইচ্ছা

করিয়া জ্ঞানকে চাপা দিয়া জন্মগ্রহণ করেন—স্থূল-লীলা আস্বাদনের জন্য—তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

জি। সাধনা দ্বারা জীব যখন চিত্তশুদ্ধি লাভ করে, যখন সে লিঙ্গের একত্ব ও শুদ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করে, যখন সে জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হয়, যখন সে নিজেকে চিনিতে পারে, তখন তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। প্রত্যেক জীবেরই এক একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। সাধক তখন নিজের ধারাই স্মরণ করে। যুগ-যুগান্তরে, কোন্ কোন্ লোকে কোন্ কোন্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কেন করিয়াছিল, তখন কি কি করিয়াছিল, কাহার কাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল, সব মনে পড়ে। শুধু মনে পড়ে না—সেই সব ব্যাপার ও দৃশ্য আবার সম্মুখে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সকল জন্ম, সকল ব্যবহার, সকল পরিচয়—কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। পূর্ব্বস্মৃতি না জাগা পর্য্যন্ত কর্ম্মরহস্য বুঝা যায় না। আমার ত এইরূপই মনে হয়।

ব। "কর্ম্মণো গহনা গতিঃ"—জ্ঞানী ভিন্ন কর্ম্মতত্ত্ব আর কেহ জানিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ের অনুভূয়মান সুখ, দুঃখ, সম্বন্ধ, পরিচয়, রাগ, দ্বেষ, আকর্ষণ, বিকর্ষণ—কিছুই অহেতুক নহে। যখন পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিতে পারিবে, তখন দেখিতে পাইবে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বহু ঘটনা ও ভাবের সহিত এইগুলি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে

জড়িত রহিয়াছে। আজ একজনকে দেখিবামাত্রই তোমার অকারণ প্রীতির বা দ্বেষের উদয় হইল—মনে করিও না, ইহা সত্য-সত্যই অকারণ। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে সব কারণ বুঝিতে পারিবে। আজ একজনে তোমার অপকার করিল—ইহারও কারণ আছে। এক বৎসরের হিসাব যেমন আর এক বৎসরে জের টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেইপ্রকার এক জন্মের হিসাব আর এক জন্মে চলিয়া যায়—এইরূপ সহস্র সহস্র জন্মের কর্ম্ম জালের ন্যায় জড়িত হইয়া যায়। কোন্ জন্মের বা কোন্ লোকের কৃতকর্ম্ম কোন্ জন্মে ও কোন্ লোকে ফলদান করিবে, তাহার কি ঠিকানা আছে? চিত্রগুপ্তের খাতা পাঠ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

জি। তবে কি আপনি বলিতে চান, নূতন কর্ম্ম কিছুই নাই? এই জন্মের প্রতি কর্ম্মেরই মূল যদি পূর্ব্বে থাকে, তবে ত আর নূতন কর্ম্ম কিছুই নাই, বলিতে হয়।

ব। নূতন কর্ম্ম আছে বই কি। তবে কোন্‌টি নূতন কর্ম্ম, আর কোন্‌টি পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ, তাহা বুঝা বড় কঠিন। নূতন বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মই কালান্তরে প্রাক্তনরূপে পরিণত হয়।

জি। পূর্ব্বস্মৃতি যখন জাগিয়া উঠে, তখন এই জগতের বহু স্থানই বোধ হয় পরিচিত বলিয়া মনে হয়। বহু

লোকের সঙ্গেই যে পরিচয় ও সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝা যায়। সমস্ত বিশ্ব একটি বিরাট্ পরিবার বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানে যে আত্মভাবের বিস্তার হয়, জগৎ আপন হইয়া যায়—তাহা বেশ ধারণা হইতেছে।

ব। ইহাও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থা নহে। জ্ঞানের আভাস মাত্র। যখন জ্ঞান আরও এক স্তর উপরে উঠে, তখন তখন সমষ্টি-লিঙ্গের সহিত ব্যষ্টি-লিঙ্গের তাদাত্ম্য অনুভূত হয়। প্রতি জীবেরই এক একটি লিঙ্গ-দেহ আছে। স্থূলদেহে অভিমান থাকা পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গগত একতা-বোধ আসে না। বস্তুতঃ, সে অবস্থায় লিঙ্গ বহু বলিয়াই ধরিতে হইবে। পরে আত্মজ্ঞানের সূত্রপাত হইলে লিঙ্গ ও স্থূলে বিবেক বা পার্থক্য হয়। তখন স্থূলের সম্বন্ধ ছাড়াইয়াও লিঙ্গকে দেখিতে পারা যায় বলিয়া লিঙ্গের শুদ্ধতা ও একতা-বোধ আসে। এই অবস্থাতেই পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি জাগিতে পারে। অবশ্য, অভিনিবেশ যদি আকারের দিকে না থাকে, তবে না জাগিতেও পারে। তবে জাগিবার যোগ্যতা অবশ্যই হয়। যখন এই জ্ঞানের বিশুদ্ধি অধিকতর হয়, তখন দেখা যায় যে, যে-লিঙ্গকে এক বলিয়া দেখিতাম, সেইরূপ আরও কোটি কোটি লিঙ্গ আছে। প্রত্যেকেই আপন আপন ধারায় বহিয়া যাইতেছে। এইগুলি সব ব্যষ্টি। পরে দেখিতে পাওয়া যায়,

এ সব লিঙ্গই একটি বিরাট্ ব্যাপক সমষ্টি-লিঙ্গের অংশ বা পৃথক্ পৃথক্ আভাস মাত্র। মূলতঃ, সমষ্টি-লিঙ্গই একমাত্র লিঙ্গ। এই অবস্থায় উপনীত হইলে—অর্থাৎ এই সমষ্টি-লিঙ্গে অভিমান হইলে—সমগ্র স্থূল জগৎটি নিজেরই রূপ বলিয়া মনে হয়। যত জীব আছে—মনে হয়, সব আমারই রূপ। নানা জীব এক জীবেরই বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র। সেই এক জীব আমি। যাহা জীবের সঙ্গে জীবের কর্ম্মগত সংঘর্ষ ছিল, এখন আর তাহা সেভাবে দেখা যায় না। বহু জীবই যখন বস্তুতঃ নাই—তখন আর কর্ম্ম কোথায় থাকে? রাগ দ্বেষ কোথায় থাকে? সব আত্মলীলা-রূপে স্ফুরিত হয়। সুখে আনন্দ, দুঃখে আনন্দ—পাপ নাই, পুণ্য নাই, সর্ব্বত্রই একটি ক্রীড়াশীল স্বাধীন ইচ্ছার আনন্দ-লহর নানা আকারে খেলিতেছে। একমাত্র মূল জীব বহু হইয়া পরস্পরের সঙ্গে খেলিতেছে। এই জীবই ঈশ্বরের জীবশক্তি ও ঈশ্বর এই জীবের স্বকীয় ঐশ্বর্য্য। এই সমষ্টি-লিঙ্গে উপনীত হইলে পরে কারণ-দেহকে আশ্রয় করিয়া অভিমান প্রকটিত হয়। তাহাই ঈশ্বরভাব। সেখানে আর বহু নাই। সুতরাং ঈশ্বর এক—তাঁহার জীব-শক্তিও এক, উভয়ে নিত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধে জড়িত আছেন। উভয়ে নিত্য-মিলিত, নিত্য-মিথুন, নিত্য-

লীলা-মগ্ন। জীবশক্তি এক হইলেও আভাস অনন্ত। ইহাই অনন্ত জীবসঙ্ঘ। আবার প্রত্যেকটি আভাসের অনন্ত আকার—অনন্ত স্থূলদেহ। ইহাই ব্যষ্টি জীবের জন্ম-বৈচিত্র্য।

সুতরাং, জীব ঈশ্বরাবস্থায় যাইয়া দেখিতে পায়—সে নিজেই সব হইয়াছে, নিজেই সব সাজিয়া খেলা করিতেছে—"অহং মনুরভবং" ইত্যাদি।

জি। ঈশ্বর "একোঽহং বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়" বলিয়া খেলিতেছেন—ইহাই ত সৃষ্টি। লোকে যাহাকে সৃষ্টি বলে, সেটা তাঁহার আত্মলীলা। কিন্তু তিনি কেন খেলেন? কে খেলায়?

ব। শাস্ত্র বলেন—তিনি খেলেন আপন স্বভাবে—"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়ম্।" স্বভাবই তাঁহাকে খেলায়—স্বভাবই মূল। তিনি স্বতন্ত্র—তাঁহার স্বভাবই সর্ব্বমূল।

জি। যোগশাস্ত্রে আছে যে, সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংস্কার কি দৃশ্য?

ব। হাঁ, দৃশ্য বই কি? অতীন্দ্রিয় হইলেই কি অদৃশ্য হয়? অতীন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ আছে। প্রজ্ঞার আলোকে সবই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন চিত্ত বা লিঙ্গ-দেহ সাক্ষাৎকৃত হয়, তখন লিঙ্গদেহস্থিত সংস্কারও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সংস্কারানুসারে জন্ম ও কর্ম্ম উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়।

জি। জীবের পূর্ব্ব পরিচয় বলিতে কি এই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বুঝিতে হইবে ?

ব। না, তা কেন ? প্রথমতঃ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে পরে যখন লিঙ্গশোধন হইতে থাকে, তখন এই স্মৃতি জাগিতে থাকে বলিয়া ইহা প্রথমাবস্থার পরিচয়। বিশুদ্ধ লিঙ্গদেহ প্রতিষ্ঠার পরে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে এই লিঙ্গ-দেহ গ্রহণই জন্ম। ইহা বস্তুতঃ একবার হয় বলিয়া তখন জন্মও এক ভিন্ন অধিক মনে হয় না। লিঙ্গদেহ গ্রহণ হইতে লিঙ্গ ত্যাগ পর্য্যন্ত জীবের জীবন—আয়ুঃ। ঐ দেহগ্রহণই জন্ম, ঐ দেহ-ত্যাগই মৃত্যু। এ জন্মও একবার মাত্র, এ মৃত্যুও তাই। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সেইজন্য জীবের একাধিক জন্ম—জন্মান্তর-বাদ—স্বীকৃত হয় নাই। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জন্ম বলি, অর্থাৎ লিঙ্গের সহিত স্থূলের সম্বন্ধ, তাহা লিঙ্গ শুদ্ধ হইলে আর জন্ম বলিয়া মনে হয় না। লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইলে অভিমান লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাই তখন লিঙ্গই আত্মারূপে প্রতিভাত হয়—যেমন এখন স্থূলদেহ আত্মরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রকার। সেই জন্য সহস্রবার স্থূল সম্বন্ধ হইলেও উহা জন্ম বলিয়া বিবেচিত হয় না। যেমন একটি বস্ত্র গ্রহণ করিলে জন্ম হয় না, ছাড়িলেও মৃত্যু হয় না—তদ্রূপ স্থূলের গ্রহণ ও ত্যাগ বস্তুতঃ

জন্ম ও মৃত্যু নহে। সকল জীবের একবারই জন্ম হয়, একবারই মরণ হয়।

ইহার পরে অন্যান্য লিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। তদনন্তর সমষ্টি-লিঙ্গ দর্শন হয় ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া অভিমান হয়। তখন জানা যায় যে, সব লিঙ্গ ঐ মহালিঙ্গেরই অংশ। এই অবস্থায় নিজেকে বিশ্বব্যাপকরূপে জানা যায়। ইহাই জীবের স্বরূপ বলিতে পার। একদিকে যিনি নিত্য-ঈশ্বর, অন্যদিকে তিনিই নিত্য-জীব—অথচ বস্তুতঃ তিনি শুদ্ধচৈতন্য মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বরূপসিদ্ধি—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিভূতি।

জিজ্ঞাসু। কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, একথা আপনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, কিন্তু যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ঐশ্বর্য্য বা যোগবিভূতি বলে, তাহাও কি কর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়? অনেকে বলেন, বিভূতি জ্ঞানের পরিপন্থী, সুতরাং উহা হেয়। জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান এবং মুক্তি। বিভূতি প্রকাশিত হউক বা না-ই হউক, তাহাতে জ্ঞান বা মুক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না।

বক্তা। বৎস, যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে যোগ-বিভূতি বলে, তাহা যোগ-প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে প্রকাশিতই হয় না। লৌহ দহন-সামর্থ্য লাভ করিলে ঐ শক্তিকে তাহার বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিভূতি পরমাত্মার স্বাভাবিক শক্তি-স্বরূপ। যখন আবরণ কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে জীব নিজের পরিচয় কিছু কিছু প্রাপ্ত হয় ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, তখন হইতেই তাহার শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বিভূতি আগন্তুক ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তাহার জন্য পৃথক্

প্রয়াস করিতে হইবে। ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না—চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আপনিই জাগে। রোগ কাটিয়া গেলে যেমন দেহে বল-সঞ্চার হয় এবং ঐ বল যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ, সেই প্রকার অবিদ্যা কাটিয়া গেলে আত্মশক্তির স্ফুরণ হয় এবং ইহা অবিদ্যা-নিবৃত্তির লক্ষণ।

জি। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ব্যুত্থানাবস্থায় যাহা সিদ্ধি, নিরোধ অবস্থার পক্ষে তাহা অন্তরায়স্বরূপ। সিদ্ধি যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে তাহাকে অন্তরায় বলা হইত না। পতঞ্জলি এবং তদনুযায়ী যোগিসম্প্রদায়ের মতে বিভূতি সকল নির্ম্মল আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে উদিত হয়। উহারা জ্ঞান ও কৈবল্যের প্রতিবন্ধক।

ব। বৎস, আত্মা যদি স্বভাবতঃ সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে তাহাতে শক্তির বিকাশ অন্তরায়-রূপে পরিগণিত হইতে পারিত। অগ্নির সঙ্গে দাহিকা শক্তির যে সম্বন্ধ, প্রদীপের সঙ্গে প্রভার যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত আত্মশক্তিরও সেই* প্রকার সম্বন্ধ জানিবে। আত্মা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়-স্বরূপ—নিখিল শক্তির স্ফুরণ আত্মা হইতেই হইয়া থাকে, এবং উহাদের লয়-স্থানও আত্মাই। দেবলোক, গন্ধর্ব্ব-লোক, নরলোক এবং অন্যান্য যে-কোন লোকে

যে-কোন শক্তি দেখিতে পাও, সবই আত্মারই শক্তি, জানিও। আত্মার অনন্ত শক্তি আধার-ভেদে অভিমান ও প্রকাশের তারতম্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শক্তির পরিচ্ছিন্ন প্রকাশই জড়ত্বের নিদর্শন। জীবাত্মা যতদিন শক্তি-দরিদ্র থাকে, ততদিনই উহার বন্ধন ও জড়ত্বের আবেশ জাগরূক থাকে—অভিমানের সত্তাও ততদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু যখন অভিমানরূপ গণ্ডী অতিক্রান্ত হয়, জড়-ভাবের আচ্ছাদন অপগত হয়, তখন বিশুদ্ধ আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নিখিল শক্তি ক্রমশঃ অনাবৃতভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই জ্ঞান-লাভ বা শক্তি-প্রকাশের তিনটি অবস্থা আছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমি তাহাকে সিদ্ধি, মহা-সিদ্ধি ও অতিসিদ্ধি এই তিন প্রকার নামকরণ করিতে ইচ্ছা করি। সিদ্ধি অবস্থায় শক্তি দ্বৈতভাবে উপলব্ধ হয়,—ইহা জ্ঞেয়, ভোগ্য বা দৃশ্য রূপে আত্মায় ফুটিয়া উঠে। আত্মার সহিত ইহার অভিন্নতা-সম্পাদন সাধনার পরিপাকে দ্বিতীয় অবস্থায় হইয়া থাকে। তখন অনন্ত শক্তির অন্তর্গত কোন শক্তিরই বাহ্য স্ফূর্ত্তি থাকে না, শক্তিপুঞ্জ তখন আত্মাতে অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান থাকে, আত্মা হইতে পৃথক্ বা দৃশ্যরূপে তাহাদের সত্তা থাকে না। তখন একমাত্র

আত্মা আপনাতে আপনি পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে থাকেন,—ইহাকেই আমি মহাসিদ্ধি বলি। তোমরা হয় ত ইহাকে কৈবল্য বা অদ্বৈত-স্থিতি বা অন্য কোন নামে অভিহিত করিবে। কিন্তু ইহার পরেও অবস্থা আছে। এই অদ্বৈত অবস্থা হইতে ইচ্ছানুসারে শক্তির বহিরুন্মেষ অথবা দ্বৈতের উদয় অতিসিদ্ধির লক্ষণ। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, তোমার ভোগ্য অন্ন যখন তণ্ডুলাদিরূপে বর্ত্তমান ছিল, তখন উহার অপক্ক বা অসিদ্ধ অবস্থা। আগুন জ্বালাইয়া তাহার সাহায্যে জল প্রভৃতি উপকরণ অবলম্বন করিয়া ঐ তণ্ডুলকে পরিপক্ক করা হইল এবং উহা অন্নরূপে পরিণত হইল—ইহা সিদ্ধাবস্থার নিদর্শন। এই অবস্থায় ভোগ্য বস্তু ভোগ্যরূপে, অথচ ভোক্তা হইতে পৃথগ্‌ভাবে, বর্ত্তমান থাকে। ইহার পর যখন তুমি ঐ অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলে, তখন অন্নের পৃথক্ সত্তা আর থাকিল না—উহা তোমাতে মিশিয়া তোমারই দেহের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, দেহ হইতে অন্নের পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকিল না। মহাসিদ্ধির অবস্থা কতকটা এইরূপ। দীর্ঘকাল পরেও যদি তুমি আপন দেহ হইতে ঐ অন্ন—এমন কি, ঐ তণ্ডুল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিতে পার, তবে

উহাকে অতিসিদ্ধির উদাহরণরূপে মনে করিতে পার।

বৎস, ব্যুত্থান এবং নিরোধকে সমান করিয়া উভয়কে সমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অতিসিদ্ধি অবস্থার উদয় হয়। যোগী কোন অবস্থারই দাস নহেন। দ্বৈত অথবা অদ্বৈত কোন অবস্থাতেই তিনি বদ্ধ হন না—অথচ তিনি সর্ব্ব অবস্থারই দ্রষ্টা ও উপলব্ধি-কর্ত্তা।

আমি যে-ভাবে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতি-সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, একটি অবস্থাই ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে হইতে চরমাবস্থা পর্য্যন্ত উপনীত হয়। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কিন্তু মহাসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনি দ্বৈত অবস্থায় বর্ত্তমান। এ অবস্থায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে লৌকিক ও অসিদ্ধ সাধকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া ভ্রমে পতিত হইও না। যে অসিদ্ধ, তাহার সাধ্য অথবা উপাস্য বস্তুর বিকাশই হয় নাই। কিন্তু আমি যে সিদ্ধ অবস্থার কথা বলিতেছি, তাহাতে উপাস্য অথবা ধ্যেয় বস্তু সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়—সাধকের দৃষ্টিতে তখন কোনও আবরণ থাকে না। কিন্তু উপাস্য বস্তুর প্রকাশ হইলেও উপাসকের

সহিত তাহা অভেদপ্রাপ্ত হয় না—তখন উপাস্য এবং উপাসকের ভেদ পরিস্ফুটরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই অবস্থাকেই ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ইহার পরের অবস্থায় এই ভেদ আর থাকে না, তখন উপাস্য এবং উপাসক পরস্পর মিলিত হইয়া এক অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়। তখন যে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তা বিরাজমান থাকেন, তাঁহাকে উপাস্য কিম্বা উপাসক কিছুই বলা চলে না। ইহাই মহাসিদ্ধির অবস্থা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই অদ্বৈত অবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা এবং ইহার পরে আর কোনও অবস্থা নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ইচ্ছার স্ফুরণ মাত্র এই অবস্থা হইতে যদি পূর্ব্ববৎ ভেদাবস্থা জাগান যায় এবং ইচ্ছামাত্রই উহাকে নিরুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত অবস্থার প্রাদুর্ভাব করান যায়, তাহা হইলে উহাকে যোগের অতিসিদ্ধ অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি ব্যুত্থান এবং নিরোধ উভয়ের অতীত, যিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের অতীত এবং যিনি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থার অতীত, তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে অসঙ্গস্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। নিজের এই অবস্থার উপলব্ধি করাই অতিসিদ্ধির লক্ষণ। অতিসিদ্ধ যোগী ক্রিয়াশীল হইয়াও নিষ্ক্রিয় এবং

নিত্য-নিষ্ক্রিয় হইয়াও সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ। কিছুতেই তাঁহার বন্ধন নাই। সুতরাং তাঁহাকে মুক্ত বলাও ভাষার অপপ্রয়োগ মাত্র। ঈশ্বরের সংকল্পে যখন সৃষ্টির উদয় হয়, তখন কি তুমি মনে কর, ঈশ্বর আবদ্ধ হইয়া পড়েন? তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরের সত্তা হইতে যাহা প্রবাহক্রমে বহির্গত হয় তাহার দ্বারা ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হন? এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। যখন তিনি কোনও শক্তির স্ফুরণ করেন, তখন উহা তাঁহা হইতে যেন কতকটা পৃথক্ ভাবেই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পার্থক্য কখনই হয় না। তদ্রূপ, আবার যখন উহাকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আত্মস্বরূপে বিলীন করেন, তখন উহা তাঁহার সঙ্গে অভিন্নবৎ বর্ত্তমান থাকে। ভেদের সময় ভেদও যেমন অলীক, অভেদ অবস্থায় অভেদও তেমনি অলীক—অথচ দুই-ই সত্য।

এবার তোমার প্রশ্নের সমাধান বুঝিতে পারিবে। সিদ্ধি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা দৃশ্যরূপে আত্মা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত থাকে। ভেদদৃষ্টি থাকিবার জন্য ঐ অবস্থায় আসক্তি কিম্বা প্রলোভন অথবা অহঙ্কার অত্যন্ত সূক্ষ্ম আকারে থাকিবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ দ্বৈতভাব থাকা পর্য্যন্ত অভয়-পদের

প্রাপ্তি হইতেই পারে না। তুমি সিদ্ধিকে যে অন্তরায়রূপে গণনা করার কথা বলিয়াছ, তাহা এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সত্য, কারণ ঐ সকল শক্তি আত্মশক্তি-রূপে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা অভেদজ্ঞান ও তন্মূলক উপশম-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কিন্তু যখন ঐ সকল শক্তি আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্যে আত্মশক্তি-রূপে পরিণত হইয়া যায়, উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ আর থাকে না, উহাদিগকে আত্মারই স্বাভাবিক স্ফুরণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে—যখন আত্মস্বরূপে উহারা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তাহার পর মহাশক্তির কৃপায় পূর্ব্ববর্ণিত অতিশক্তির অবস্থার উদয়ে আবার যখন যোগীর ইচ্ছানুসারে প্রকটিত হয়, তখন উহাদের অন্তরায়ত্ব থাকে না। বস্তুতঃ দ্বৈত এবং অদ্বৈত বিকল্প হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে স্বাতন্ত্র্যরূপা নির্ব্বিকল্প-সিদ্ধি আয়ত্ত হয় না।

জি। আপনি এই যে অতিসিদ্ধি নামক অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন, ইহাই কি সিদ্ধির পূর্ণরূপ? অথবা ইহার উপরেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা আছে?

ব। বৎস, ইহা সিদ্ধির পূর্ণরূপ বটে, কিন্তু পূর্ণতর অথবা পূর্ণতম রূপ নহে। কারণ, এই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান থাকে। ইচ্ছা থাকিলেই অভাব থাকিবেই,

কারণ, যেখানে অভাব নাই সেখানে ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না। কিন্তু অভাব থাকিলেও এই অবস্থার অভাব প্রচলিত অভাবের ন্যায় নহে। তোমরা জগতে যে প্রকার অভাব দেখিতে পাও, তাহা হইতে এই অবস্থার অভাবের প্রভেদ এই যে, ইহা স্বভাবের সঙ্গে যোগকালে উদিত হয় বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অভাব-নিবৃত্তিকেই শাস্ত্রে পরমানন্দের আস্বাদন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অভাব-বোধই বিরহ এবং উহার নিবৃত্তিই মিলন। স্বভাবের সম্বন্ধে এই মিলন ও বিরহ চক্রাবর্ত্ত-ক্রমে নিত্যলীলারূপে বিরাজ করিতেছে। ইচ্ছার উদয় ভিন্ন আনন্দের আস্বাদন হইতেই পারে না। যে তৃষ্ণার্ত্ত নহে সে জলের আস্বাদন কি করিয়া বুঝিবে? শুধু জলে মাধুর্য্য থাকিলেই উহার অনুভব হয় না—উহার জন্য পিপাসা থাকা চাই। সেইরূপ, স্বভাবরূপ অমৃত-ভাণ্ডার বর্ত্তমান থাকিলেও যতক্ষণ আকাঙ্ক্ষা না জাগে এবং উহার সঙ্গে সংযোগ না হয়, ততক্ষণ অমৃতের আস্বাদন পাইবার কোনই উপায় নাই। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে অমৃত্ব-হ্রদে ডুবিয়া গেলেও তাহার আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে না। আমি অতিসিদ্ধি নামে যে অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহা মহাশক্তির চরণ-স্পর্শ-জনিত

পরমানন্দ উপলব্ধির অবস্থা মাত্র। ইচ্ছাশক্তি এই-খান হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় যেমন অভাব জাগে, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিবৃত্তি হয়। স্বভাবের সঙ্গে যোগের এমনিই মহিমা। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, অভাব যখন নিবৃত্তই হয়, তখন উহার জাগিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর তোমাকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার একমাত্র প্রয়োজন আনন্দের আস্বাদন। মা সন্তানকে এই কৌশলে নিজের অপার মাধুরী উপভোগ করাইয়া থাকেন। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এইখানে করিবার প্রয়োজন নাই, উহা সময়ান্তরে হইতে পারিবে।

জি। আপনার কথা হইতে বুঝিতে পারিলাম, এই অতিসিদ্ধি অবস্থাই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা। এই আনন্দময় অবস্থার পরের অবস্থা কিরূপ, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব। যখন আনন্দেরও আর স্ফুরণ হয় না, তখনকার অবস্থাকে ঠিক আনন্দময় বলিয়া নিরূপণ করা চলে না। উহা আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়েরই অতীত। জগন্মাতার কোলে উঠিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার পর আনন্দও কাটিয়া গেলে এই দ্বন্দ্বাতীত ও মোহের অতীত অবস্থায় স্থিতি হয়। তোমরা কি বলিবে,

জানি না—আমি কিন্তু ইহা বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। ইহার বর্ণনা সম্ভবপর নহে।

জি। বাবা, আপনি অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন। আমাকে নিম্নভূমির অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আপনি একটু নামিয়া আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ দিন্।

আচ্ছা, আপনি যে সিদ্ধির বর্ণনা করিলেন, ইহা কি এক, অথবা বহু। সিদ্ধির সংখ্যা কত। পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি আয়ত্ত করিবার উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ উপায় আছে কি ?

ব। সিদ্ধি বাস্তবিক পক্ষে এক ও অখণ্ড, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিভক্তবৎ হইয়া তাহা লোকের নিকট বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া থাকে। আমি যাহাকে সিদ্ধি, মহাসিদ্ধি এবং অতিসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাকে প্রকারান্তরে ক্রিয়াসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি বলিয়া মনে করিতে পার। তোমাদের পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদে যে সকল খণ্ডসিদ্ধির উল্লেখ আছে, তাহার অনেকগুলি এই ক্রিয়াসিদ্ধিরই অন্তর্গত। কতকগুলিকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধিও বলা যাইতে পারে। নিজের উপাদান্ বিশুদ্ধ করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে নানা ভাবে কার্য্য করাইতে পারা যায়। বলিতে কি, পাতঞ্জলে

যে কয়টি সিদ্ধির উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক সিদ্ধি ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করা যাইতে পারে। যাহার উপাদান বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহাতে কিছুই বাহাদুরী নাই। যে ভাল করিয়া বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগের প্রক্রিয়া অবগত আছে, তাহাকে যেমন শব্দের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করিতে বেগ পাইতে হয় না, ঠিক সেই প্রকার যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-রূপা শক্তির তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি এই স্থূলজগতে না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য নাই। ভূত-জয়, ইন্দ্রিয়-জয় এবং বিবিধ সংযম হইতে যে সকল সিদ্ধি আবির্ভূত হয়, শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত যোগীর পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাপ্তি, যত্রকামাবসায়িত্ব,—এই অষ্টসিদ্ধি ব্যতিরেকে আকাশ-গমন, পরকায়া-প্রবেশ, পরচিত্ত-জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি এবং আরও বহুসিদ্ধির কথা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু সত্ত্ব-সিদ্ধি হইলে পৃথক্ ভাবে কোন সিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতে হয় না। যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইলে অবস্থা-বিশেষে সিদ্ধি সকল আপনিই উদিত হয়,—যে লুব্ধচিত্তে সিদ্ধির প্রার্থনা করে,

সে কখনই প্রকৃত যোগ-সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

জি। আকাশ-গমন কি প্রকারে স্থূলদেহে সম্ভবপর হয়? দেহ যতক্ষণ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের অধীন, ততক্ষণ শূন্যে উত্থান ও শূন্যপথে গমনাগমন কি প্রকারে হইতে পারে? আর যোগীর পক্ষে শূন্য-গমনের আবশ্যকতাই বা কি?

ব। দেহের উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া নবকলেবর উৎপন্ন হইলে, ঐ দেহ আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এবং সঙ্কোচ-বিকাশশীল হইয়া থাকে। শূন্যে উঠিবার সময় স্থূল সংস্কার সমূহ ক্রমশঃ ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়। যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, ততদূর পর্য্যন্ত জ্ঞানের বিকাশ থাকে, পরে আরও উপরে উঠিয়া গেলে জ্ঞান ও অন্যান্য বৃত্তি নিস্তব্ধ হইয়া যায়। অপক্ব দেহ লইয়া ঊর্দ্ধগমন চলে না, উপরে উঠিতে উঠিতে দেহের অস্থি মাংস প্রভৃতি একাকার হইয়া পিণ্ডীভূত হয়, সমস্ত শরীরটি কোমল হইয়া তরল—এমন কি বাষ্পময়—অবস্থা ধারণ করে। আকাশমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রাদি সর্ব্বত্রই স্থূলদেহে যাতায়াত করা যায়। যে স্থানে যাইতে হয়, সেই স্থানের পরমাণু আকর্ষণ করিয়া স্থূলদেহের উপাদান গড়িয়া লইতে হয়। মৎস্য যেমন জল মধ্যে সন্তরণ করে, যোগীর স্থূলদেহ সেই

প্রকার এই বিশাল বায়ুমণ্ডলে সন্তরণ করিতে করিতে তীব্রবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। শূন্যপথে চলিবার সময় শুধু গম্য স্থানটি একাগ্রভাবে স্মরণ করিতে হয়—তাহা হইলে স্বভাবের নিয়মে সরলরেখা অবলম্বনে দেহ আপনিই সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকে, পথের পরিচয় বা দিঙ্-নির্ণয়ের আবশ্যকতা হয় না। উড়িয়া যাইবার সময় পৃথিবীর কোন স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইলে তৎক্ষণাৎ মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া হইয়া হঠাৎ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা,—প্রথম অভ্যাসকালে এই প্রকার বিপদের আশঙ্কা খুবই থাকে। আমি একবার গুঙ্করায় একটি বাদাম গাছের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম—শরীরে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল। আর একবার একটি ছাদে পড়িয়া গিয়াছিলাম,—অবশ্য ইহা প্রথম সময়ের কথা। স্থূলদেহে শূন্যমার্গে পৃথিবীর কোন স্থানে যাইতে হইলে একটু বেশী পরিমাণ উপরে উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত। তাহা হইলে কোন প্রতিবন্ধক বাধা দিতে পারে না। শূন্য পথে চলিবার বাধা অনেক প্রকার। উচ্চ পর্ব্বতাদি পথে থাকিলে দেহ স্বাভাবিক আকর্ষণে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলে যে সকল গভীর আবর্ত্ত আছে, তাহাতে আট্‌কাইয়া যাইবার আশঙ্কা খুব অধিক। ইহা ছাড়া

এক এক স্থানের প্রাকৃতিক আকর্ষণ এত বেশী যে, তাহার টানে পথভ্রষ্ট হইয়া ভ্রান্ত হইবার ভয় আছে। তীব্রভাবে বল প্রয়োগ করিয়া ও বিশেষ সংযমের সহিত ঐ সকল সঙ্কট স্থান উত্তীর্ণ হইতে হয়। অনেক সময় মেঘের ন্যায় বাতাবরণে নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া চলিতে হয়—সেই অবস্থায় যোগীর গতি কেহই দেখিতে পায় না। তবে যোগী ইচ্ছা করিলে লোককে দেখাইয়াও চলিতে পারেন। যদি অন্ধকার রাত্রে বেশী উর্দ্ধে ও অত্যন্ত বেগের সহিত গমন করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে দেখিলে মনে হইবে, যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল।

জি। আকাশ-গমনকালে কি যোগীর বাহ্যজ্ঞান থাকে ?

ব। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে বাহ্যজ্ঞান রাখা যাইতেও পারে। তবে বাহ্যজ্ঞান রাখিয়া তীব্রবেগে চলা যায় না, চলিতে গেলে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। দেহসিদ্ধি করিয়া সেই দেহকে গম্যস্থানের উপযোগী উপাদানে নির্ম্মাণ করিতে হয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন এই পৃথিবীতে যে ভাবে দেহের সন্নিবেশ দেখিতে পাও, তখন তাহা ঠিক সেইরূপ থাকে না। নিজের লক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ চিন্তা বা ভাব তাহাতে উদিত হইলেই উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা। চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ না হইলে ইহা

সম্ভবপর নহে। চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক বা অন্যান্য লোক—যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, তদনুসারে দেহকে গড়িয়া লইতে হয়। যে দেহে চন্দ্রলোকে যাওয়া যায়, সেই দেহে সূর্য্যলোকে গমন সম্ভবপর হয় না। যাইতে চেষ্টা করিলে ঐ দেহের ধ্বংস অনিবার্য্য। স্বর্গের দেহ, নরকের দেহ, লোক-লোকান্তরের দেহ—সবই পৃথক্ পৃথক্। সর্ব্বত্রই পরমাণু ও তাহার সংস্থানের তারতম্য আছে। মোট কথা, মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত শক্তির বিকাশ করিয়া মাধ্যাকর্ষণকে অভিভূত করিতে না পারিলে ব্যোমপথে বিচরণের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। জীবের নীচ-ভাব সকল মাধ্যাকর্ষণ হইতেই ফুটিয়া উঠে। স্থূল বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যতদূর পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে, পার্থিব বাসনা ও কামনাদির ছায়া ঘেরিয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পরেও জীব এই সকল বাসনাতে জড়িত থাকে বলিয়া মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া বাসনানুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্থূল বায়ুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া নির্ম্মল নভোরাজ্যে বিচরণ করিবার সামর্থ্য না হইলে মৃত্যুকে জয় করিয়া জন্মের অতীত শুদ্ধ দশা প্রাপ্ত হওয়ার আশা নাই। স্থূল বায়ুচক্রের ঊর্দ্ধে অতি মধুর, অতি স্নিগ্ধ, অতি লঘু, সুশীতল আনন্দময় বায়ুর লহর

খেলিতেছে। সেই বায়ুর লহরে লহরে যোগী উঠিয়া যান। তখন বিভিন্ন জাগতিক পদার্থের স্মৃতি থাকে না—রাখিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। তবে চেষ্টা করিলে তাহাও পারা যায়। তবে নাভিধৌতিতে অভ্যস্ত না হইলে নিজেকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়া প্রবল শক্তির মধ্যে সঞ্চরণ করা যায় না।

জি। বাবা, বুদ্ধদেব, মুসা, খ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ সকলেই শূন্যপথে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এ খেচরী সিদ্ধির আবশ্যকতা কি? ইহা না হইলে কি যোগপথে উন্নতি করা যায় না?

ব। যোগমার্গে উন্নতি করিলে এ ক্ষমতার বিকাশ হইবেই। ইহা বায়ু ও ব্যোম-তত্ত্বের সিদ্ধি। যোগীকে একটি একটি করিয়া সকল তত্ত্বই আয়ত্ত করিতে হয়—তবে ত সেই নিরাবরণ চিদাকাশে অবস্থান ও সঞ্চরণ সম্ভবপর হয়। বৎস, কঠিন সাধনা ভিন্ন যোগী হওয়া যায় না।

জি। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে প্রবেশ পূর্ব্বক সহস্রদল কমলের কর্ণিকার মধ্যস্থিত সুধাবর্ষী চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে আপ্লুত হইয়া চিদানন্দময় স্বরূপে রসধারা পান করাই, চক্রভেদপরায়ণ যোগীর লক্ষ্য। আকাশ-গমনাদি সিদ্ধি লাভ না করিলেও ত ইহা হইতে পারে?

ব। বৎস, নাভির সহিত সহস্রারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নাভিক্রিয়াতে পরিপক্ক না হইলে সহস্রারের প্রবল তেজোরাশির মধ্যে অভিভূত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। আকাশ-গমনের ক্ষমতা নাভিক্রিয়া-সিদ্ধির লক্ষণ। কুণ্ডলিনীকে চেতন করিতে হইলে নাভিচক্রে যে ব্রহ্মগ্রন্থি আছে, তাহার উন্মোচন করিতে হয়—পরে বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থিরও উন্মোচন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জি। ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে একটি একটি করিয়া অনেক বিষয় জানিবার আছে। দেহতত্ত্ব, নাড়ীচক্রের স্বরূপ, সৃষ্টি-রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য—অনেক বিষয়ের আলোচনাই এখন বাকী রহিয়া গেল।

ব। যোগ এবং সূর্য্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার ইহা অবকাশ নহে। ঐ সকল তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। তবে অবকাশ অনুসারে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সাধন-তত্ত্বের সমালোচনা-উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে যোগসম্বন্ধে অতি-সামান্য দু-একটি কথা যাহা বলিয়াছি, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। জগদম্বার ইচ্ছা হইলে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুধু শ্রবণ করিয়া এই সকল গুহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথ

জ্ঞানলাভ হয় না—অবিরাম পরিশ্রম করিয়া ইহা উপলব্ধি করিতে হয়। গ্রন্থাদিতে যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম কিম্বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা-কিছু লিপিবদ্ধ দেখিতে পাও, তাহা অত্যন্ত অল্প। তাহা হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ষট্‌চক্রের চিত্র এবং বিবরণ আজকাল ঘাটে-পথে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা এই সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মাত্র। চক্রাদির স্বরূপ এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান কিছুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সময়ের এমনিই প্রভাব যে, এই সকল ভ্রান্ত শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্য সরল এবং স্বাভাবিক সাধন-মার্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেকটি চক্র প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারা যায়—উহার বর্ণ, দল, বীজ, শক্তি, ক্রিয়া,—সবই প্রত্যক্ষগোচর। যিনি চক্রভেদ করিয়া মাতৃকামণ্ডলীর অধিষ্ঠাতৃরূপে সহস্রারে অবস্থান করেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ —শক্তি তাঁহার বশবর্ত্তিনী। বস্তুতঃ, মহাশক্তির কৃপার আবেশপ্রাপ্ত না হইলে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র অতিক্রম করিয়া অনন্ত এবং অতল চৈতন্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন পাওয়া যায় না। দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় অবয়বকে যোগরূপ মন্থনক্রিয়ার দ্বারা

মথিত করিয়া অভিন্ন, অখণ্ড, অচ্ছেদ্য পিণ্ডরূপে পরিণত করিতে না পারিলে সাধনের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা করা বামনের চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শের প্রয়াসের অনুরূপ। যোগীর স্থূল শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং কারণ শরীর চিন্ময় সিদ্ধ-শরীর রূপে পরিণত হয়। এই জন্য যোগীর স্থূল দেহ সাধারণ লোকের স্থূল দেহ হইতে বিলক্ষণ। যোগীর লিঙ্গদেহ এবং কারণ-দেহেও সেই প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবিক পক্ষে যাহাকে তোমরা স্থূল লিঙ্গ ও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ কর, যোগীর নিকট তাহা অভিন্ন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য যোগদেহ দ্বারা প্রয়োজন অনুসারে স্থূল অথবা লিঙ্গ, অথবা কারণ, সকল অবস্থারই কার্য্য হইয়া থাকে। ভগবান্ যেমন 'কুর্ব্বন্নপি ন করোতি', অর্থাৎ সমস্ত কার্য্য করিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকেন, যোগীও তেমনিই স্থূল দেহ প্রভৃতির কার্য্য করিয়াও ঐ সকল দেহের দ্বারা আবদ্ধ হন না। যোগী ইচ্ছা করিলেই প্রাচীর প্রভৃতি ভেদ করিয়া চলিতে পারেন। সাধারণ স্থূল দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ প্রাচীরের দ্বারা অবরুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে স্থূল কোষ ত্যাগ করিয়া লিঙ্গ দেহে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবাধে পর্য্যটন করিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিও, যোগীর লিঙ্গ শরীর

বাস্তবিক লিঙ্গ-শরীর নহে—উহা একটি আভাস মাত্র। যিনি প্রকৃত যোগী, তিনি সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত থাকেন বলিয়া যে-কোনও স্থানে মুহূর্ত্তের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারেন।

যাহা হউক এই সব বিষয় অধিক বলিবার এখন প্রয়োজন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-সমর্পণ—সন্ন্যাস।

জিজ্ঞাসু। বাবা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরে শুনিব। আপাততঃ আমার দু-একটি প্রশ্নের সমাধান হইলেই আজিকার জন্য বিশ্রাম করিব। শুনিতে পাই, ত্যাগ বা সন্ন্যাস ভিন্ন না কি মুক্তি হয় না। যদি আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের আবশ্যকতা কি? কারণ, আত্মজ্ঞান ত চিত্তশুদ্ধি ও গুরু-কৃপা হইলে যে-কোন অবস্থাতেই হইতে পারে। তাহাতে এক মাত্র সন্ন্যাসীর অধিকার হইতে পারে না।

বক্তা। বৎস, সন্ন্যাস কি? সম্যক্ প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কি ত্যাগ করিবে? কেন ত্যাগ করিবে? ত্যাগের ফলাফল কিছু আছে কি? এ সব বিচার্য্য প্রশ্ন। দেখ, যাহা তোমার বস্তু নয়, তাহা তুমি ত্যাগ করিতে পার না—কিন্তু কি বস্তু তোমার আপনার, তাহা ভাবিয়া দেখ। যাহা তোমার নিজের হইবে, তাহার উপর তোমার স্বামিত্ব বা অধিকার থাকিবে। এ জগতের কোন বস্তুর উপর

তোমার তেমন অধিকার নাই। এমন কি, এত যে ঘনিষ্ঠ দেহ,—যাহার সহিত তুমি জড়িত হইয়া আছ,—যাহাকে তুমি আপনার বলিয়া জান,—যাহাকে তুমি ভ্রান্তিবশতঃ নিজের স্বরূপ বলিয়াই মনে কর, তাহাও তোমার আপনার নহে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে তাহা চালিত হয় না। তাহা প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়—তোমার ইচ্ছা এখনও এত বিশুদ্ধ ও শক্তিসম্পন্ন হয় নাই যে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া নিজের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। তোমার দেহও বস্তুতঃ তোমার আপন নহে। ইচ্ছা মাত্র দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করা তোমার আয়ত্ত নহে। ইচ্ছা করিলে তুমি দেহকে ছোট বড় হাল্কা বা অদৃশ্য করিতে পার না, তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পার নাই, দেহকে অধীন করিতে পার নাই—এ দেহ লইয়া স্বামিত্বের অহঙ্কার করা তোমার সাজে না। মনঃ-সম্বন্ধেও সেই কথা। জগতের অন্যান্য সকল বস্তুই এই দেহ, মনঃ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার সহিত সম্বদ্ধ। যদি তুমি দেহাদির স্বামীই না হইতে পারিলে, তবে জগতের কোন্ জিনিষটিকে তুমি আপন বলিতে পারিবে? আসল কথা, বস্তুতঃ তোমার নিজস্ব বলিতে সত্য সত্যই কিছুই নাই। তুমি আবার কি ত্যাগ করিবে?

জি। তাহা হইলে কি সব আপনার করিয়া লইতে হইবে? জগতের যাবতীয় বস্তু—দেহ, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, সব জয় করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে? তবে কি সব জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে আর ত্যাগ করিব কেন? আর পরিশেষে ত্যাগ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অর্জ্জন করার প্রয়োজন কি? ইহা কি শুধু ব্যর্থ শ্রম নহে?

ব। না। ব্যর্থ শ্রম নহে। ত্যাগ ভিন্ন যথার্থ ভোগের অধিকার জন্মে না। আবার ভোগাধিকার না থাকিলে ত্যাগের অধিকার হয় না। যাহারা অমৃত-পিপাসু, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে—"ত্যাগেনৈকেন দেবা অমৃতত্বমানশুঃ"। ত্যাগই অমরত্ব লাভের একমাত্র পথ। ত্যাগরূপ যজ্ঞ ভিন্ন অমৃত বা সুধার প্রাপ্তি দুর্ঘট। ত্যাগাত্মক সোপানে আরোহণ করিয়াই দিব্য ভূমিতে যাইতে হয়। ঐ দিব্যাবস্থায় ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হইয়া যায়।

ত্যাগ করিবার জন্যই অর্জ্জন আবশ্যক। অর্জ্জন করিয়া সব আপন করিতে হইবে—বিশ্বজগৎ আত্মরূপে পরিণত হইবে। কিছুই পর থাকিবে না। দেখিবে, প্রথমতঃ, সবই তোমার স্বকীয় বিভূতি। এই

জগৎটি তোমারই আপন শক্তির বিকাশ—আত্ম-বিভূতি। দ্বিতীয়তঃ, বুঝিবে সবই তুমিময়—তুমি সব সাজিয়া আছ। অর্জ্জনের চরমাবস্থায় সর্ব্বত্রই নিজেকেই দেখিতে পাওয়া যায়—সবই নিজের রূপ বলিয়া বোধে আসে। আপন রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কিছু থাকে না।

এই অবস্থায় পৌঁছিলে নিজের মধ্যেই একটি অসীম অনন্ত বস্তুর আভাস জাগিয়া উঠে। ঐটিই তখন আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরে ঐ অসীম বস্তুতে সর্ব্বময় আমিকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। ইহাই আত্মনিবেদন বা ত্যাগ। ইহার ফলই পরমানন্দ লাভ বা অমৃতত্ব-প্রাপ্তি। যাহাকে দিব্যভাব বলে। ঐ অসীম বস্তুটি নিজের অন্তর্য্যামিরূপে অন্তরাত্মায় প্রকটিত হন। ঐ পরমানন্দের আস্বাদন বা অমৃত পান বস্তুতঃ মহাশক্তিময়ী জগদম্বার স্তন্যরস-পান বা পরম ঐশ্বর্য্যলাভ। মায়ের কোলে শিশু হইতে হইলে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। নিবেদন করিবার পূর্ব্বে নৈবেদ্যের সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাকে তোমরা যোগবিভূতি বল, যদি তাহা বাস্তবিক হয়, তবে উহা এই নৈবেদ্যসংগ্রহ। যাহার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির

উদয়ই হয় নাই সে আবার কি ত্যাগ করিতে পারে? সে ত নিঃস্ব দীনহীন পথের ভিখারী—তাহার ত্যাগের অধিকার নাই। সকল জগৎকে আপন করিয়া লও—আপনাকে বিস্তার কর, আত্মশক্তির বিকাশ কর, সেই শক্তির দ্বারা অনাত্মভাবকে গ্রাস বা অভিভূত কর, সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রকাশ কর, পরে অসীম তত্ত্বাতীত অনন্ত-চৈতন্যময় সত্তা-সাগরে ঐ আত্ম-ভাবের নিরোধ কর, তবে ত অমর হইতে পারিবে। বাপু, শুধু বাব্‌লা পাতার রস খাইলে কি অমর হওয়া যায়?

জি। ঐ যে পরমানন্দের আস্বাদন, উহাকেই ত আপনি জীবের কাম্যধন বলিয়া পুরুষার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন?

ব। তাহাতে আর সন্দেহ কি? উহাই ত মুক্তি। ত্রিতাপের জ্বালায় অধীর জীব দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে ভ্রমণ করিতেছে, কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না,—সত্য বলিতে কি, শান্তি বা স্থিতি কোথাও হইতেছে না। ঐ অমৃত-পান না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি নাই। ঐ পরমানন্দ-রস যখন সে পাইবে, তখন তাহার সকল ভ্রমণ সমাপ্ত হইবে, সব অন্বেষণ শেষ হইবে, চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হইবে। মায়ের কোলের শিশু আবার মায়ের কোলে আরোহণ করিয়া মাতৃস্তন্যের রসাস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া যাইবে।

এই অমৃতপানই মায়ের প্রসাদ। ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ লইতে হয়, যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ অমৃত ভোজন করিতে হয়—ইহাই ঐ প্রসাদ বা অমৃত।

জি। সন্ন্যাস বা ত্যাগ ভিন্ন যে মুক্তি হয় না, তাহা ত ঠিকই মনে হইতেছে। জ্ঞান ভিন্নও মুক্তি হয় না, শুনিতে পাই। উভয় কথার তাৎপর্য্য কি?

ব। পূর্ব্বে তোমাকে ত সবই বুঝাইয়া দিয়াছি। জ্ঞান ভিন্ন কি ত্যাগ হয়? বিদ্বৎ-সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ন্যাস। তবে যে বলা হয়, সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না—সে শুধু বিবিদিষা-সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া। তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। বিবিদিষা-সন্ন্যাসে কর্ম্ম থাকে। ঐ কর্ম্মই জ্ঞানকে জাগাইয়া বিদ্বৎ-সন্ন্যাস উৎপাদন করে।

জি। কর্ম্ম বা যোগই জ্ঞানোদয়ের হেতু। তার পর সন্ন্যাস। আচ্ছা, মনে করুন, জ্ঞানের উদয় হইল, অথচ ঐশ্বর্য্যের বা বিভূতির বিকাশ হইল না—তাহা হইলে কেমন হইবে? তখন কি ত্যাগ করা হইবে? এমন অবস্থাও ত আছে।

ব। বৎস, জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্যের উদয় না হইয়া পারে না। ঈশ্বরভাবই ঐশ্বর্য্য—তাহা আত্মার স্বরূপ হইতে পৃথক্ জিনিষ নহে। জ্ঞানের উদয়ে যখন

আত্মার আবরণ তিরোহিত হয়, তখন আত্মার স্বভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। জ্ঞানের উদয় হইলে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইবেই—ফুল ফুটিলেই তাহাতে মকরন্দের বিকাশ হইবে। ইহাই অর্জ্জন। ইহার পর ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন বা নিবেদন—ইহাই ত্যাগ। ইহার ফল পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠা। আত্মভাব না জাগাইলে পরমাত্মভাবে প্রবেশ লাভ হয় না। আত্মার স্বভাবকে জাগাইয়া, পরে উহাকে নিরুদ্ধ করিতে হয়। এই নিরোধের পূর্ণতা হইতে অমৃতত্ব লাভ ঘটে।

আত্মার স্বভাবকে জাগান আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ সমান কথা। সুতরাং কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া পরে তাহাকে অনন্ত-মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে হয়—পরমশিবের অঙ্গে বিলীন বা যুক্ত করিতে হয়—তাহাই জীবের অমৃতলাভের উপায়। পরমশিব ও মুক্ত কুণ্ডলিনী বা পরাশক্তির মিলন হইতে নিত্য যে সুধাস্রাব হয় বা আনন্দ ক্ষরণ হয়, জীব—মুক্ত জীব, তাহাই পান করে, আস্বাদন করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যলীলা।

জিজ্ঞাসু। বাবা, এই জগতের যাবতীয় ব্যাপারই ত ইন্দ্রজাল-সদৃশ—মহাপুরুষগণ, ও শাস্ত্রমুখে ঋষিগণ, পুনঃপুনঃ ইহা বলিয়াছেন। তথাপি কেন আমরা ইহা বুঝিতে পারি না? কেন অসত্যকে অসত্য বলিয়া বুঝিয়াও তাহাকে সত্যবৎ মনে করি ও তদনুসারে ব্যবহার করি? ঐ ইন্দ্রজালের ঐন্দ্রজালিক কে, আর কে-ই বা ইহা দেখিতেছে?

বক্তা। দেখ, বৎস, ঈশ্বরই এই বিরাট্ ইন্দ্রজালের প্রদর্শক, আর জীব—বদ্ধজীব, ইহার দ্রষ্টা। জীবের নেত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিথ্যার আবরণ বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে সত্য বস্তুর দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকে। ঈশ্বর মায়াবী—মায়া দ্বারা বদ্ধ জীবকে বিমোহিত করিয়া সত্যস্বরূপের দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখেন ও নানাপ্রকার বিচিত্র ভাবের প্রদর্শন করেন। আত্মাই সত্য বস্তু—তিনি চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু জীব মোহবশতঃ আত্মাকে দেখিতে পাইতেছে না, অতি সন্নিহিত হইলেও তাহার উপলব্ধি

করিতে পারিতেছে না। অবিদ্যা-সম্বন্ধই ইহার হেতু। ঈশ্বর কি বস্তু তাহা ত জান? বিশুদ্ধ চৈতন্য বস্তু শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রকাশমান হইলে যে উজ্জ্বল আলোকের প্রকাশ হয়, সেই আলোকই ঈশ্বর। ইনি যে শুদ্ধ শক্তিযুক্ত—তাহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় শক্তি এই শুদ্ধা ঐশীশক্তির বাহ্যপ্রকাশ। অব্যাহত জ্ঞান, অপ্রতিহত ইচ্ছা প্রভৃতি ইঁহার বৈশিষ্ট্য। ইঁহাতে স্বভাবের প্রেরণায় সংকল্পের উদয় হয়—ইনি সত্যপ্রতিষ্ঠ বলিয়া এই সংকল্পরূপ বীজ বিকল্পদ্বারা উপহত হয় না এবং বাহ্যরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। ইহাই সৃষ্টি। সংকল্পই ইহার মূল। এই যে বাহ্যরূপে বিকাশ বলিলাম, ইহাও অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরাবস্থায় সৃষ্টিই নাই—একমাত্র আত্মসত্তা নিস্তরঙ্গ-ভাবে প্রতিভাত হয়, আর অপরাবস্থায় আত্মসত্তায় শক্তির উন্মেষরূপ তরঙ্গ তাহাতেই সংযুক্তভাবে তদাত্মকরূপে প্রকটিত হয়। অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মসত্তার পর অপর কোন ভাবই প্রত্যক্ষ হয় না, চৈতন্য-সাক্ষাৎকার হয় না—সাক্ষাৎকার হয় যাহার, তাহা জড়প্রকৃতি ও তাহার বিকার। কিন্তু বস্তুতঃ জড় বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই—চিৎশক্তিই অজ্ঞানবশতঃ জড়রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেইজন্য সৃষ্টি বা দৃশ্যপদার্থ ঈশ্বর হইতে অভেদাত্মক

হইলেও অজ্ঞানী জীব তাহাকে পৃথক্‌রূপে এবং জড়ভাবেই দেখে। পৃথক্ ভাবে দেখাই বাহ্যদর্শন। জ্ঞানের উদয় হইলে এই বাহ্যদৃষ্টি থাকে না—অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণ হয়। তখন জড়ত্ব ও ভেদ-বোধ লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে যাহা দেখা যায় —তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় স্ফুরণমাত্র, ঐশ্বরিক সংকল্পের আত্মভূমিতে প্রকাশ। ইহাই বিশ্বরূপ-দর্শন। এটা বিশুদ্ধ সত্ত্বের তরঙ্গিত অবস্থা। এ অবস্থায় আত্ম-দর্শন হয়—তাহার কোলে কোলে জগদ্দর্শনও হয়। বলা বাহুল্য, এই জগৎ আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়—অবশ্য তখনও কিঞ্চিৎ ভেদাভাস থাকে, নতুবা জগৎ বলিয়া জ্ঞান হইত না। তবে এই অবস্থায় বাহ্যভাব থাকে না এবং জড়ত্ব-বোধ লুপ্ত হয় বলিয়া এ জগৎও চৈতন্যোজ্জ্বল সত্ত্বময় বলিয়া প্রতীত হয়। এ যেন দর্পণে দৃশ্যমান নগরী। বস্তুতঃ, বিশ্ব তাহাই। ভগবান্ যখন অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন, তখন এই বিশ্বরূপই দেখাইয়াছিলেন। এটা সবিশেষ আত্মারই দর্শন। স্থূলদৃশ্যের ন্যায় এ বিশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গোচর নহে—কিন্তু অতীন্দ্রিয়। বিশোধিত মনঃ বা প্রজ্ঞা দ্বারাই ইহার দর্শন হয়। ইহার পরে ক্রমশঃ চিত্ত-দর্পণ বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তাহার স্বচ্ছ পৃষ্ঠ হইতে

দৃশ্যমান প্রতিবিম্বীভূত বিশ্বনগরীর চিত্র মুছিয়া যায়, বিকল্প ত পূর্ব্বেও ছিল না—শুদ্ধ সংকল্পও তখন স্তিমিতভাব ধারণ করে, আত্মা তখন অন্তর্লীন-শক্তি-ভাবে প্রকাশমান হন। ইহাই নির্ব্বিশেষ আত্মার দর্শন। চিত্ত তখন আত্মার সমশুদ্ধ হইয়া অদৃশ্য বা অব্যক্ত হইয়া যায়। তাহার স্ফুরণ থাকে না।

স্থূল উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্রই, সংস্কার না জাগিলে, বিশ্বরূপ-দর্শন অবশ্যম্ভাবী। সংস্কার জাগিলে জড়ভাব থাকে বলিয়া ওটা অলীক বিকল্পময় দর্শন হয়।

জি। এ বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল দেখে কে? কে তাহাতে মোহিত হয়? কেন হয়? এ ইন্দ্রজাল কাটিবার উপায় কি?

ব। এ ইন্দ্রজাল দেখে বদ্ধজীব। বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন মলিন-সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ লইয়া খণ্ডিত এবং আবৃতভাবে প্রকাশমান হন, তখনই তাঁহাকে বদ্ধজীব বলে। রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধ হইতেই বন্ধন হয়—জীবের স্বরূপগত উপাধি বিশুদ্ধ সত্ত্বের অংশ। এই জন্যই জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হয়। এই স্বরূপোপাধি লইয়া থাকিলে জীব জীবভাবেই মুক্তিলাভ করে।

জীব নিত্যবস্তু, ঈশ্বরও নিত্যবস্তু—অংশও নিত্য,

অংশীও নিত্য। অংশ বলিতে টুক্‌রা মনে করিও না—আভাস বুঝিও। তাই জীবমাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন নিজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়—সে ঈশ্বরত্ব বা শিবভাব লাভ করে। ইহার পরেও অবস্থা আছে—কারণ, ঐশ্বর্য্যলাভ করিলেই স্বভাবস্থিতি হয় না। ঐশ্বর্য্য ফুটাইয়া পুনরায় তাহাকে নিরোধ করিলে তবে অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাহাই সকলের লক্ষ্য।

মুক্ত জীব এবং ঈশ্বরে অভেদ না থাকিলেও ভেদাভেদ সম্বন্ধ—মুক্তিকালে অভেদ ও ভেদ উভয়ই প্রকাশমান হয়। কিন্তু বদ্ধজীব মলিন দ্বৈতভাবে আবদ্ধ। ঈশ্বর ও জীবের আত্মা অভিন্ন বস্তু। ঈশ্বরের সংকল্প হইতে শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল যে সৃষ্টির স্ফুরণ হয়, যাহাকে মুক্ত-জীব আত্মা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ ভাবে দেখে না, তাহা বদ্ধজীবের নেত্রে সংকল্পাত্মক ভাবে স্ফুরিত হয় না, প্রতিভাসময় মনে হয় না, ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হয়। বদ্ধজীব ঐ শুদ্ধ সংকল্পময় সৃষ্টিকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সুতরাং অচেতন, পৃথক্ ও মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া বোধ করে। ইহার কারণ অজ্ঞান—অর্থাৎ তাহার আত্মজ্ঞান নাই বলিয়া সে

বুঝিতে পারে না যে ঐ সৃষ্টি আত্মশক্তিরই বিজৃম্ভণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাই উহা সত্য মনে করে—মনে করে, যেন তাহার নিজের সত্তা ছাড়া উহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে। সে সৃষ্টি-দৃষ্টি-বাদী হয়। আত্মজ্ঞানের প্রথম বিকাশমাত্রই দৃষ্টি-সমকালীন সৃষ্টি হয়, সিদ্ধ সংকল্পাবস্থার উদয় হয়—তখন সে দৃষ্টি-সৃষ্টি-ব দী হইয়া থাকে। ইহার পরাবস্থায় সৃষ্টিই থাকে না। তাহাই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান।

বদ্ধজীব সংকল্পকে—আভ্যন্তর ভাবকে—বাহ্য রূপে, জড় রূপে, পদার্থ রূপে, অনুভব করে। তাই সে জগৎকে সত্যভাবে অনুভব করে—যাহার স্ফুরণে জগতের বিকাশ, তাহা সে জানে না। যতক্ষণ সংকল্পের সঙ্গে বিকল্পের মিশ্রণ থাকে, ততক্ষণ ইহা হইবেই। বিকল্প উঠে চাঞ্চল্যবশতঃ, বায়ুর প্রভাবে, রজোগুণের প্রাবল্যে। কিন্তু মূলে তমঃ না থাকিলে, আত্মবিস্মৃতি-রূপ আবরণ না থাকিলে, বিকল্পের উদয় হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানের উদয় হইবামাত্র তমোনিবৃত্তি হয়—সেই জন্য রজঃও স্থির হইয়া সত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়—বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকটিত হয়। তখন আর জীব ভেল্কি দেখিয়া ভুলে না।

জি। ইহা হইতে এই বুঝিলাম যে, বদ্ধজীবই ইন্দ্রজালের দ্রষ্টা—তবে সে ইন্দ্রজালকে অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্রজাল

বলিয়া, অলীক বলিয়া, জানে না—সত্য বলিয়া মনে করে ও তাহারই অনুধাবন করে। তাহার মোহিত হইবার কারণ এই যে, তাহার দৃষ্টি অবিদ্যাচ্ছন্ন। সুতরাং অবিদ্যা-নিবর্ত্তক জ্ঞানের উদয় ভিন্ন এই ইন্দ্রজালকে ধরিবার উপায় নাই। জ্ঞান না হইলে জগৎকে সত্য মনে করিতেই হইবে।

ব। ঠিক কথা। জ্ঞানী ভিন্ন প্রকৃতির চালাকী কাহার সাধ্য ধরিতে পারে? জ্ঞানী ভিন্ন প্রকৃতি কাহারও নিকট নিজের রহস্য প্রকট করেন না। যে জ্ঞানী, সে কখনও প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয় না—কারণ, সে সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই প্রত্যক্ষ অনুভব করে—আত্মভাবে বোধ করে। নিরন্তর আলো জ্বালিয়া রাখিলে যেমন অন্ধকার কাছে আসিতে পারে না, তদ্রূপ নিরন্তর আত্মজ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত থাকিলে অনাত্মভাবের উদয় হইবার অবকাশ হয় না। জড়রূপে যে দৃশ্যদর্শন হয় তথা অনাত্মভাব। আত্মজ্ঞান অভিভূত না হইলে তাহা কদাপি জাগিতে পারে না। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন বলিয়া, দ্বিতীয় কিছুই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় না। আত্মশক্তির উন্মেষকালে যাহার ভান হয় সেই জগৎও চৈতন্যাত্মক, ব্রহ্মময়। এই প্রকার জ্ঞানবান্ যোগীর নিকট প্রকৃতির লুকাচুরি কিছু

প্রচ্ছন্ন থাকে না। জ্ঞানী জানেন, প্রকৃতি একমাত্র বস্তুকেই বাসনাবাসিত অজ্ঞানীর নেত্রে নানা প্রকার চিত্র-বিচিত্র বর্ণে ফুটাইয়া তোলেন—অজ্ঞানী তাহা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাহাকে পাইয়া তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। অন্তর্দ্দর্শী জ্ঞানী দেখিতে পান, যাহা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্য আছে, সব তাঁহারই আত্মা—যাহা নিত্যসিদ্ধ নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু। তাই জ্ঞানী নির্ব্বিকার, আপ্ত-কাম, অচঞ্চল ও ধীর। তাঁহার বাসনা নাই, কামনা নাই, স্পৃহা নাই, চলন নাই। প্রকৃতি বা ঈশ্বরই এই ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন। যে অবিদ্যাগ্রস্ত, সে ইহা দেখিয়া বাহ্য-বোধে মোহিত হইতেছে। জ্ঞানের অঞ্জনে অজ্ঞান-তিমির অপসারণ কর, দেখিবে, কোথাও ইন্দ্রজাল নাই—সর্ব্বত্র ঐশ্বরিক শক্তির লীলা চলিতেছে। ইন্দ্রজাল প্রতারণামাত্র—অসত্যকে সত্যরূপে দেখান। বস্তুতঃ, উহা ঈশ্বরের কার্য্য নহে —কারণ তিনি সত্যময় বস্তু, প্রতারণা তাঁহাতে নাই। বদ্ধজীবের অন্তরে প্রতারণার বীজ রহিয়াছে বলিয়া সে প্রতারিত হইতেছে। ভ্রান্তিবশতঃ যেমন অস্ফুটা-লোকে রজ্জুকেও সর্প মনে হয়, তদ্বৎ অজ্ঞানের প্রভাবে আত্মশক্তির বিকাশকে জড়, দ্বৈত ও অনাত্মভূত মনে হইতেছে। তাই অজ্ঞানীকে বলিতে হইলে বলিতেই

হইবে যে, তাহার দর্শন অলীক—জগৎ মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তাহাই বলা হয়, ঈশ্বর ইন্দ্রজালের প্রদর্শক। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, যাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে, তাঁহার নিকট কোথাও ইন্দ্রজাল নাই—মায়াও নাই, মায়াবীও নাই—তিনি দেখেন জগৎ সত্য, যাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় জগৎ বলিয়া মনে হইত, তাহা আত্মশক্তিরই লীলা মাত্র, তাহা ব্রহ্মময়, চৈতন্যময়। যে শক্তির ক্রীড়া হইতেছে, তাহা ব্রহ্মশক্তি, চিৎশক্তি, জ্ঞানীর আত্মশক্তি—জড়শক্তি নহে। সুতরাং জ্ঞানী সমগ্র জগৎকে ভগবান্ পরমাত্মার লীলারূপেই দর্শন করেন। জ্ঞানী ব্রহ্মময় জগৎকে সত্যই দেখেন—মিথ্যা দেখেন না। জ্ঞানী কদাপি প্রতারিত হন না—তিনি সত্যকে সদ্ভাবেই দেখিতে পান। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি কখনও জগৎকে মিথ্যা দেখেন না।

সুতরাং একটি নিত্যলীলা চলিতেছে—তাহাই বদ্ধ অজ্ঞানী জীব জড়ভাবে বাহ্যভাবে দেখিতেছে। ইহাই ভ্রান্তিদর্শন। মুক্ত জীব, জ্ঞানী, তাহাকে চিৎশক্তির বিলাসরূপে ও আন্তরভাবে দেখিতেছে।

এক অনাদি মহাশক্তিই ঈশ্বর ও জীবভাবে নিজের সঙ্গে নিজেই দ্বৈতাদ্বৈতের মধুর লীলা করিতেছেন। যিনি যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত—তিনি সেই লীলার দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারেন। বদ্ধজীব মায়াচ্ছন্ন

বলিয়া মহামায়ার লীলার আস্বাদন পায় না। সে জড়ত্বের আবরণে আবদ্ধ থাকে।

সৃষ্টি ও সংহার এই লীলাভিনয়ের দুইটি দিক্ মাত্র। তুমি জ্ঞান-নেত্র উন্মীলন করিয়া মধ্যরেখাতে প্রবেশ কর—দেখিবে, সব তাঁহারই আত্মলীলা। পরে বিন্দুতে প্রবিষ্ট হইলে দেখিবে, ব্যক্ত লীলা অবসান হইয়াছে। একটি স্বপ্রকাশ চিরস্থির বস্তুই আপনা-আপনি ভাসিতেছেন। এসব কথা বলিয়া বুঝাইবার নহে। যে ক্রিয়া করিবে, করিয়া নিজে সব উপলব্ধি করিবে, সে-ই বুঝিতে পারিবে।

জি। পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামী আপনাকে বলিয়াছিলেন—"এ খেলার খেলা যিনি দেখাইতেছেন, তিনি জানেন না। যিনি জানেন, তিনিই জানেন।" তবে কি এই বিশ্বলীলার যিনি সূত্রধার, তিনি স্বয়ং ইহার কিছুই জানেন না? জ্ঞান ভিন্ন যে-লীলার দর্শন হয় না, সে-লীলার অভিনয় কি অজ্ঞানে হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে এই কথাটি বুঝিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ব। হাঁ, দাদাগুরুদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই বলিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবই জীবেশ্বরভাবে এই লীলার অভিনয় করিতেছেন। এই বিশ্বলীলার মূল ইচ্ছাশক্তি নহে; কিন্তু স্বভাব। ইচ্ছাশক্তি নিজেও এই লীলা বা সৃষ্টিরই অন্তর্গত। যে-ভূমিতে

ইচ্ছাশক্তি বা জ্ঞানশক্তির স্ফুরণ হয়, তাহার পূর্ব্বাবস্থাতেই লীলার সূত্রপাত। জ্ঞান ও ইচ্ছা স্বভাব হইতে স্ফুরিত হয়। সুতরাং স্বভাব জ্ঞানের অতীত। তাই বলা হইয়াছে, তিনি জানেন না। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে জ্ঞান বা অজ্ঞান বলি, তাহা সেখানে নাই। লীলা-স্ফূর্ত্তি স্বভাব হইতে হইতেছে বটে, কিন্তু এ লীলার দর্শক কে? এ লীলার দর্শক তিনি, যিনি আত্মজ্ঞাননিবন্ধন সাক্ষিভাবাপন্ন। অর্থাৎ যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত—এই বিশ্বলীলার দর্শক ও উপভোক্তা। ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাম্যপ্রাপ্ত জীব (মুক্তজীব) এই লীলার দর্শক। জীবের বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞানের পরদা থাকে বলিয়া লীলাদর্শন হয় না।

স্বভাবই এই খেলা খেলাইতেছেন, আবার জীবেশ্বরভাবে তিনিই ইহা দেখিতেছেন। স্বভাব সুধার সমুদ্র—তিনি তিনিই। যে তাহা পান করে, সে-ই তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করে। নিজের মাধুর্য্য নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইলেই নিজেকে জীব ও ঈশ্বরভাবে বিভাগ করিয়া লইতে হয়। তাই তিনি অবিভক্ত থাকিয়াও নিত্য জীব ও ঈশ্বররূপে খেলা করিতেছেন। জড়জগৎ এই খেলার উপকরণ মাত্র।

এস, আজ আমরা এই স্বভাবরূপিণী জগদম্বাকে প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করিতে চাই। সময়ান্তরে আবার তাঁহার পুণ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব-কথা সংক্ষিপ্তভাবেই সমাপ্ত করিলাম। এই সব বিষয়ের আলোচনা যত বিস্তারিত রূপেই করা হউক, তাহাতেও সকল কথার সমাবেশ হয় না। মানব-হৃদয়ের জিজ্ঞাসা অনন্ত, জিজ্ঞাসার বিষয়ও অসংখ্য। মানব-জীবনের স্বল্পতাবশতঃ সকল জিজ্ঞাসার সমাধান এক জীবনে কাহারও হইয়া উঠে না। বলিতে কি, অনেক সময় একটি প্রশ্নের সমাধান করিতেও মনুষ্যের বহু জন্ম কাটিয়া যায়। বস্তুতঃ এই প্রকার আলোচনা হইতে যে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না, তাহা শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের উপদেশ হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়।

কিন্তু মনুষ্যের মন ঔৎসুক্য-প্রবণ বলিয়া সব বিষয়েই তাহার একটা প্রবল অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। এই ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য অনেক সময়ে গ্রন্থাকারে শঙ্কা-সমাধানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধন-জীবনের প্রারম্ভ হইতে সাধনার পরিসমাপ্তি অথবা সিদ্ধি পর্য্যন্ত অধ্যাত্মপথের একটি ক্রমিক চিত্র আগ্রহশীল পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপন করাই বর্ত্তমান তত্ত্ব-প্রসঙ্গের অন্যতম প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তভাবে আমরা

এই প্রয়োজন সাধন করিতে যত্ন করিয়াছি। যিনি প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তিনি অন্তরের অন্তস্তলে লক্ষ্য করিয়া বহির্বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেই জগদ্‌গুরু তাঁহার সরল হৃদয়ের সকল প্রকার সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিবেন। আমরা সকলেই যেন শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে শিষ্যভাবাপন্ন হইয়া সেই বিশ্বগুরুর চরণতলে শরণ গ্রহণ করিতে পারি, ইহাই তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা। "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। আমরা প্রপন্ন হইতে পারিলে তিনি যেপ্রকার শাসন করা আবশ্যক, তাহা নিজেই করিবেন। সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই।